Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal.
as Bengali Rapid Reader Prose for Class VIII
[*Vide Notification No. Syl/65/55. Dated, 18th October, 1955*]
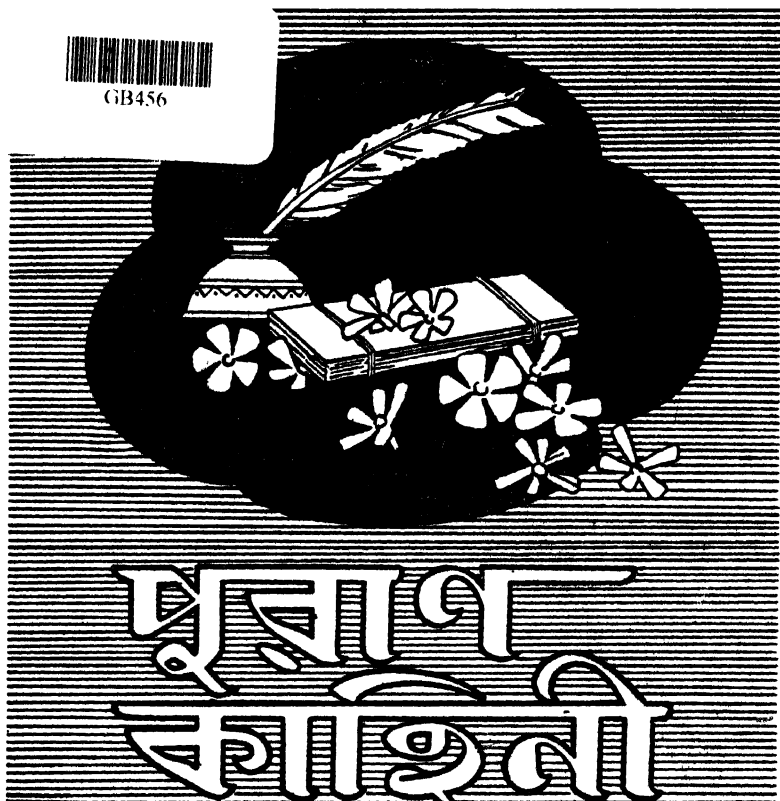
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

॥ ভারতী মন্দির ॥
॥ কলিকাতা ৬ ॥

সূচীপত্র

পরশুরামের কাহিনী

পূর্ব্বকালে কান্যকুব্জ দেশে গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল, তাঁহার নাম সত্যবতী। সেকালে ঋষিরা রাজকন্যা বিবাহ করিতেন। মহর্ষি ভৃগুর পুত্র ঋচীক এই কন্যাকে বিবাহ করিবার বাসনায় রাজার নিকট প্রার্থী হইলেন। ঋচীক বলিলেন —"মহারাজ, যদি ঋষিকে কন্যাদান করতে আপত্তি না থাকে—তা হ'লে আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করি।"

গাধি বলিলেন—"হে তপোধন, আপনাকে কন্যা দান করতে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনার ন্যায় মহাতপা ঋষিকে জামাতা রূপে লাভ করলে আমি সৌভাগ্যই মনে করব। তবে আমাদের একটি কৌলিক

প্রথা আছে। আমাদের রাজবংশে কন্যা গ্রহণ করতে হ'লে এক সহস্র অশ্ব আপনাকে দিতে হবে।"

ঋচীক বলিলেন—"আমি ঋষি, এত অশ্ব কোথায় পাব ? কিন্তু বিনা পণেও আমি বিবাহ করতে চাই না। আপনি আমাকে ছয়মাস সময় দিন।"

মহারাজ গাধি সম্মত হইলেন।

ঋচীক বরুণের নিকট সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। বরুণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এক সহস্র অশ্ব দান করিলেন। ঋচীক এক মাসের মধ্যেই অশ্ব লইয়া উপস্থিত। একমাত্র অপূর্ব্ব রূপবতী কন্যাকে তপস্বীর হস্তে দান করিবার ইচ্ছা বোধ হয় গাধির ছিল না। সেজন্য এক সহস্র অশ্ব কন্যাপণ চাহিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন একজন তপস্বী একটা ঘোড়াই যোগাড় করিতে পারে না—এক হাজার ঘোড়া কোথা হইতে পাইবে ? ঋষিকে রাজা ভয়ও করিতেন খুব, সাহস করিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন নাই—যদি শাপ দিয়া বসেন। তাই বোধ হয় ঐ ভাবে এড়াইতে চাহিয়াছিলেন। অনেক রাজাই অভিশাপের ভয়ে তপস্বীর হস্তে কন্যাদান করিতেন। এক সহস্র অশ্ব লইয়া যখন ঋষি উপস্থিত, তখন গাধির আর কন্যাদান করা ছাড়া উপায় থাকিল না।

ঋচীক সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া তপোবনে চলিয়া আসিলেন। পিতা ভৃগু আসিলেন পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য। সত্যবতী শ্বশুরের সেবা করিতে লাগিলেন ভক্তিভরে। ভৃগু বলিলেন—"বৎসে, তুমি বর প্রার্থনা কর।"

সত্যবতী বলিলেন—"তাত, যদি দয়া ক'রে বর দান করেন—তবে আমায় পুত্রবর দিন। আর আমার জননীর আজও কোন পুত্র হয় নি, তাঁরও একটি পুত্র হোক।"

ভৃগু বলিলেন—"আমি যজ্ঞ ক'রে যে চরু দেবতাকে উৎসর্গ করব—তার অর্দ্ধেক অংশ তুমি ডুমুর গাছকে আলিঙ্গন ক'রে খাবে, আর অশ্বত্থ গাছকে আলিঙ্গন ক'রে যেন তোমার মা চরুর দ্বিতীয় অর্দ্ধ খান।"

যজ্ঞের পর চরুভাণ্ড লইয়া সত্যবতী পিতৃগৃহে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সত্যবতী ভুল করিয়া অশ্বত্থগাছকে আলিঙ্গন করিয়া আর তাঁহার জননী ডুমুর গাছকে আলিঙ্গন করিয়া চরু ভক্ষণ করিলেন।

ভৃগু যখন এই ভুলের কথা জানিতে পারিলেন—তখন বলিলেন—"তোমার গর্ভে যে সন্তান হবে, সে ঋষি হ'য়েও হবে স্বভাবে ক্ষত্রিয়, আর তোমার মাতার গর্ভে ক্ষত্রিয় বীরের জন্ম হ'লেও সে হবে শেষে ঋষি।"

সত্যবতী বলিলেন—"তাত, আমার পুত্র যেন স্বভাবে ক্ষত্রিয় না হয়,—পৌত্র যেন স্বভাবে ক্ষত্রিয় হয়।"

ভৃগু বলিলেন—"তথাস্তু।"

যথাকালে সত্যবতীর এক পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম হইল জমদগ্নি। ক্রমে জমদগ্নি উগ্রতপা ঋষি হইয়া উঠিলেন। তিনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপতি প্রসেনজিতের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিলেন। রেণুকার গর্ভে জমদগ্নির চারিপুত্রের জন্ম হইল। তাঁহাদের এক জনের নাম রাম।

একসময় জমদগ্নি রেণুকার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্রদের বলিলেন—"মাতৃবধ কর।" তিন পুত্র সম্মত হইলেন না। রাম মাতৃহত্যা করিয়া পিতৃআজ্ঞা পালন করিলেন। জমদগ্নি তিন পুত্রকে অভিশাপ দিলেন—"তোমরা জড়বুদ্ধি হইয়া থাক।" তিনি রামকে বলিলেন—"তুমি যা ইচ্ছা বর প্রার্থনা কর।" রাম বলিলেন—"তাত, যদি বরদান করেন, তবে আমার মা পুনর্জ্জীবন লাভ

করুন, আর আমার ভাইরা তাঁদের বোধশক্তি ফিরে পেয়ে দীর্ঘজীবী ও মহাজ্ঞানী হ'য়ে উঠুন। আর মাতৃহত্যার পাপ যেন আমাকে স্পর্শ না করে।" জমদগ্নি পরশুরামকে এই বর দিলেন। পরশু দ্বারা মাতৃহত্যা করার জন্য রামের নাম হইল পরশুরাম। এই পরশুরাম সত্যবতীর পৌত্র, স্বভাবে ক্ষত্রিয়। আর সত্যবতীর যে ভ্রাতাটির জন্ম হইল, তিনিই বিশ্বামিত্র। তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও পরবর্ত্তী জীবনে ঋষি হইয়াছিলেন।

একবার চন্দ্রবংশীয় হৈহয় রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন মৃগয়া করিতে আসিয়া জমদগ্নির আশ্রমে অতিথি হ'ন। জমদগ্নি তাঁহার হোমধেনু কপিলার সাহায্যে অর্জ্জুন ও তাঁহার বহুশত, অনুচরকে ভূরিভোজনে আপ্যায়িত করিলেন। যাইবার সময় রাজা ঋষির কপিলাটিকে চাহিলেন। জমদগ্নি তাহা দিতে সম্মত হইলেন না, বলিলেন,—"মহারাজ, আপনার ঐশ্বর্য্যের অভাব কি? আমি বনবাসী ঋষি, আমার আর কোন সম্পদ নেই। এই হোমধেনুটি হারালে আমার যাগযজ্ঞ সব বন্ধ হ'য়ে যাবে।"

অর্জ্জুন বলিলেন—"মহর্ষি, আমি আপনাকে সহস্র গাভী দেব —আপনি এই ধেনুটি আমাকে দিন।"

ঋষি বলিলেন—"আমি সহস্র গাভী নিয়ে কি ক'রে পালন করব, মহারাজ? আমার কপিলাটি গ্রহণ করবেন না। এ কপিলা নিয়ে গিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না। আমার আশ্রম হ'তে চ'লে গেলে কপিলা ধনরত্ন, খাদ্যপানীয় কিছুই প্রসব করবে না, এক বিন্দু দুধও দেবে না।"

মহারাজ অর্জ্জুনের দুর্ম্মতি হইয়াছিল। তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। কপিলাকে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। পরশুরাম তখন আশ্রমে ছিলেন না। তিনি আশ্রমে আসিয়া সব কথা

শুনিয়া অর্জ্জুনের নর্ম্মদাতীরের রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পরশুরাম অর্জ্জুনকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। অর্জ্জুনের ছিল এক হাজার হাত। এক হাজার হাতে হাজার রকমের অস্ত্র ধরিয়া তিনি যুদ্ধ করিতে আসিলেন। পরশুরাম তাঁহার কুঠারের দ্বারা অর্জ্জুনের হাতগুলি একে একে কাটিয়া শেষে মুণ্ডটি কাটিয়া ফেলিলেন এবং অর্জ্জুনের সৈন্যসামন্তদের বধ করিয়া হোমধেনু কপিলাকে তপোবনে ফিরাইয়া আনিলেন।

অর্জ্জুনের পুত্রেরা একদিন জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া জমদগ্নিকে একলা পাইয়া বধ করিয়া প্রতিহিংসা লইল। পরশুরাম তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া পিতার ছিন্নমুণ্ড দেহ দেখিয়া ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"পৃথিবীতে একজন ক্ষত্রিয়কেও রাখ্‌ব না। আমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করব।"

জননী রেণুকা পতির চিতায় আরোহণ করিয়া সহমরণে গেলেন। সহমরণের আগে পরশুরামকে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন,—"ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস পেলে এই ভারতবর্ষকে কে রক্ষা করবে? সমগ্রদেশ বন্য বর্ব্বরদের হাতে চ'লে যাবে। ঋষিদেরই বা কে রক্ষা করবে? অরাজক দেশে মানুষ বাস করতে পারবে না।"

পরশুরাম মায়ের আদেশ শুনিলেন না। তিনি একে একে সকল রাজা, রাজন্য ও ক্ষত্রিয়দের বধ করিতে লাগিলেন। একবারে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতে পারে না। অনেকেই লুকাইয়া বাঁচিয়া রহিল, অনেক ক্ষত্রিয়সন্তান ক্ষত্রনারীদের গর্ভে থাকিয়া গেল। এক এক করিয়া পরশুরাম একুশ বার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করিলেন।

পরশুরামের গুরু ছিলেন শিব। একবার শিবের সঙ্গে অসময়ে দেখা করিবার জন্য তিনি কৈলাসে যান। শিবের আশ্রমের দ্বারে

গণেশ ছিলেন প্রহরী। গণেশ পরশুরামকে বাধা দেন—পরশুরাম রাগিয়া গণেশের একটা দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন।

একদিন পরশুরামের পিতামহ ঋচীক পরশুরামের কাছে আসিয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি আর ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস কোরো না—তারা এখন শান্তশিষ্ট ভাবে ধর্ম্মপথে থেকে প্রজাপালন করছে—তারা ঋষিদের উপর অত্যাচার করে না, বরং ঋষিদের তপ-জপ যাগযজ্ঞ সমস্তই রক্ষা করছে—তপোবনের কাছেও রাক্ষসদের আসতে দেয় না। তুমি আর তাদের উপর নিষ্ঠুর হ'য়ো না।"

পিতামহের কথায় পরশুরাম এক মহাযজ্ঞ করিয়া পৃথিবীর আধিপত্য কশ্যপকে দান করিলেন। তারপর তপস্যার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

বহুকাল পরের কথা। রামচন্দ্র জনকরাজার গৃহে হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাকে বিবাহ করিয়া মিথিলা হইতে অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন। পরশুরাম তাঁহার গুরু শিবের ধনু রামচন্দ্র ভাঙ্গিয়াছেন শুনিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বত হইতে আসিয়া রামচন্দ্রের পথ রোধ করিলেন। দশরথ ভয় পাইয়া পরশুরামের চরণতলে পড়িয়া বলিলেন—"হে মহর্ষি, বারবার ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস ক'রে সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য কশ্যপকে দান ক'রে মহেন্দ্রপর্ব্বতে তপস্যা করছেন। আপনি ত আর ক্ষত্রিয় ধ্বংস করবেন না ব'লে আশ্বাস দিয়েছেন। আবার কেন এই বালক বধ করতে এসেছেন—আমাকে বধ করুন। বালক রামচন্দ্রকে অব্যাহতি দিন।"

পরশুরাম দশরথের কথায় কর্ণপাত না করিয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন—"তুমি আমার নাম গ্রহণ করেছ এত বড় তোমার স্পর্দ্ধা! তুমি হরধনু ভেঙেছ, তুমি আমার হাতের এই হরিধনুতে শরযোজনা কর দেখি।"

রামচন্দ্র পরশুরামের হাত হইতে বিষ্ণুধনু লইয়া অবলীলাক্রমে তাহাতে শরযোজনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পরশুরামের দেহ হইতে বিষ্ণুতেজ রামচন্দ্রের দেহে চলিয়া গেল। পরশুরাম নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র বলিলেন—"এ শর আমি নিক্ষেপ ক'রে আপনার কোন্ পথ রুদ্ধ করব, বলুন।"

পরশুরাম বলিলেন—"রাম, আমাকে মহেন্দ্রপর্ব্বতে ফিরে যেতে দাও—তুমি আমার পরলোকের পথ রোধ করতে চাও, কর'। আমার কাজ শেষ হয়েছে—আমি এইবার যোগবলে দেহত্যাগ করব। যে তেজ আমার দেহে ছিল—তা তুমি আকর্ষণ ক'রে নিয়েছ। আমি এখন সামান্য একটা মানুষ মাত্র।"

এই বলিয়া পরশুরাম বিদায় লইলেন। ইহার পর আর কোন পুরাণে পরশুরামের দেখা পাওয়া যায় না।

[মহাভারত, রামায়ণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ভাগবত ইত্যাদি পুরাণে পরশুরামের কাহিনী আছে।]

বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জের রাজা গাধির সন্তান। ইনি ক্ষত্রিয় রাজা হইলেও তপস্যার দ্বারা ঋষি হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সঙ্গে ইঁহার বহুকাল ধরিয়া বিবাদ চলিয়াছিল। বশিষ্ঠের সঙ্গে বিবাদ করিতে গিয়া বিশ্বামিত্রের ধারণা জন্মিল, ব্রহ্মবল সকল বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তখন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন।

তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য দেবতারা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। বারবার তাঁহার তপোভঙ্গও হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই তিনি দমেন নাই। আবার নূতন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

একবার ক্ষুধায় কাতর হইয়া তিনি চণ্ডালের গৃহে কুক্কুর-মাংস খাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীপুত্রের এমন দুর্দ্দশা হইয়াছিল যে, তাঁহার পত্নী অন্নের জন্য পুত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজা ত্রিশঙ্কু বহুদিন ধরিয়া তাঁহার স্ত্রীপুত্রদের প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে—বশিষ্ঠের মুখে ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্রের দানের খ্যাতি শুনিয়া, তাঁহার

দানশীলতার পরীক্ষার জন্য একবার বিশ্বামিত্র তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন। যে যাহা প্রার্থনা করিত, হরিশ্চন্দ্র তাহাই দান করিতেন। বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের কাছে সমগ্র পৃথিবী দানস্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। হরিশ্চন্দ্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহাই দান করিলেন। তারপর বিশ্বামিত্র দানের দক্ষিণা চাহিলেন। হরিশ্চন্দ্র সরলভাবে বুঝিয়া প্রচুর ধনরত্ন দান করিতে গেলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন—"এসবে তোমার আর অধিকার নেই। তুমি যখন পৃথিবী দান করেছ, তখন এসব আগেই আমার হ'য়ে গেছে। তুমি নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ক'রে আমার দক্ষিণা দান কর।"

হরিশ্চন্দ্র কাশীর এক ব্রাহ্মণের গৃহে মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থসংগ্রহ করিলেন, কিন্তু দক্ষিণার পক্ষে তাহাও যথেষ্ট হইল না। তখন তিনি কাশীর মণিকর্ণিকা শ্মশানঘাটে নিজেকে এক চণ্ডালের কাছে বিক্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রের কাছে ঋণ পরিশোধ করিলেন।

শৈব্যা ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী হইয়া থাকিলেন। পুত্র রোহিতাশ্ব ব্রাহ্মণের পূজার পুষ্পচয়ন করিত। একদিন পুষ্পচয়নকালে সর্পাঘাতে রোহিতাশ্বের মৃত্যু হইল। শৈব্যা মৃতপুত্রকে সৎকারের জন্য মণিকর্ণিকার শ্মশানে লইয়া গেলেন। হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা পরস্পরকে চিনিলেন না—হরিশ্চন্দ্র সৎকারের কড়ি দাবি করিলেন। শৈব্যা রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে চিনিলেন—তাঁহারা তখন মৃতপুত্রের সঙ্গে চিতায় প্রাণ ত্যাগের জন্য উদ্যত হইলেন।

"পুত্রকোলে করি রাজা করিল ক্রন্দন।
কোথা এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন॥

এ ধর্ম্ম করিতে দুঃখ দিল নারায়ণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া আজি ত্যজিব জীবন॥
তখন চন্দন কাষ্ঠে জ্বালাইয়া চিতা।
মধ্যেতে বসিল পুত্র, পাশে মাতাপিতা॥
যে কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে।
হেনকালে ধর্ম্মরাজ কহেন সাক্ষাতে॥
অগ্নিতে পুড়িয়া কেন ত্যজিবা জীবন।
আমি জীয়াইয়া দিব তোমার নন্দন
পদ্মহস্ত বুলাইল বালকের গায়।
বিষজ্বালা দূরে গেল চক্ষু মেলি চায়॥" (কৃত্তিবাস)

এমন সময় বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হইয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যধন সমস্ত ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ

"শুন হরিশ্চন্দ্র মহীপতি।
আপনার রাজ্যে তুমি যাও শীঘ্রগতি।
স্ত্রীপুত্র লইয়া রাজা করিল গমন।
প্রসন্নমানস মুনি প্রফুল্লবদন॥
অযোধ্যায় রাজা আসি দিলা দরশন।
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা করিলা তখন॥" (কৃত্তিবাস)

বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রের রাজভাণ্ডারের একটি কড়িও স্পর্শ করেন নাই। কাজেই রাজভাণ্ডার পূর্ণ ই ছিল। বহুদিনের সঞ্চিত অর্থে হরিশ্চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন।

[এই কাহিনী দেবীভাগবত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে। তাহা হইতে কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে গ্রহণ করিয়াছেন।]

বিশ্বামিত্রের কৌৎস নামে এক শিষ্য ছিল। কৌৎস গুরু-দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন—"বাপু হে, তোমার

সেবায় আমি তুষ্ট হয়েছি—তাই তোমার যথেষ্ট দক্ষিণা। তুমি দরিদ্র ঋষিসন্তান, কোথায় ধনসম্পদ পাবে? কেন বারবার দক্ষিণার কথা তুলছ?"

কৌৎস তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া বলিলেন "না,—গুরুদেব, কিছু দক্ষিণা না দিলে আমার মনের তুষ্টি হচ্ছে না, আমার সমস্ত বিদ্যা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।"

বিশ্বামিত্র তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বটে? দক্ষিণা দেবে? আচ্ছা দাও, চৌদ্দকোটি স্বর্ণমুদ্রা আমি দক্ষিণা চাই।"

সূর্য্যবংশের রঘু রাজা তখন বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিতেছিলেন; কৌৎস রঘু রাজার কাছে গিয়া এই ধন প্রার্থনা করিলেন। রঘু তখন দানপর্ব্ব শেষ করিয়া নিঃস্ব নিঃসম্বল হইয়াছেন। রঘু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কুবেরপুরী আক্রমণ করিয়া ঐ অর্থ লইয়া আসিয়া কৌৎসকে দান করিলেন। কৌৎস এই ধনসম্পদ বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণাস্বরূপ দিলেন। বিশ্বামিত্র অবাক হইয়া গেলেন।

[বিষ্ণুপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ]

বিশ্বামিত্র পত্নী ও পুত্রদের ত্যাগ করিয়া সমুদ্রকূলে তপস্যা করিতে গেলেন। বিশ্বামিত্রের মহিষীর দারুণ অন্নকষ্ট হইল। সন্তানদের প্রতিপালন করিতে না পারিয়া তিনি মধ্যম পুত্রকে বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে বাকী দুই পুত্রের পালনের ব্যবস্থা করিলেন। ক্রেতা বিশ্বামিত্রের পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল—এজন্য তাহার নাম হইল গালব। সত্যব্রত নামক একজন রাজা গালবকে উদ্ধার করিয়া নিজের গৃহে পালন করিতে লাগিলেন এবং বিশ্বামিত্রের স্ত্রীপুত্রদের প্রতিপালনেরও ভার লইলেন।

বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি ঋচীক অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে বলিদানের জন্য মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে দান করেন। বিশ্বামিত্র তাহা জানিতে

পারিয়া শুনঃশেফকে দুইটি ঋক্‌গাথা শিখাইয়া দিয়া যজ্ঞস্থলে উচ্চ-স্বরে গাহিতে উপদেশ দেন। ঐ ঋক্‌মন্ত্রগানের ফলে স্বয়ং ইন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শুনঃশেফকে বাঁচাইয়া দেন।

মন্বন্তরের সময় দেশে অনাবৃষ্টির জন্য দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার তপোবনে একটিও ফল বা একমুষ্টি অন্ন না পাইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া নগরে আসিলেন। কিন্তু নগরেও কোথাও অন্ন পাইলেন না। ক্রমে তিনি নগরের প্রান্তে চণ্ডালপল্লীতে উপস্থিত হইলেন।

দরিদ্র চণ্ডালপল্লীতে খাদ্যের আরও বেশী অভাব, সর্ব্বত্র মৃতদেহ, কুকুর-শিয়ালের গলিত শব, জীবজন্তুর অস্থি ছড়ানো রহিয়াছে। বহু অন্বেষণ করিয়াও তিনি খাদ্যদ্রব্য পাইলেন না। চণ্ডালপল্লী প্রায় জনশূন্য।

এক চণ্ডাল শিকার করিয়া একটি বন্য কুক্কুরের মাংস আনিল। ক্ষুধায় কাতর বিশ্বামিত্র গৃহের বাহির হইতে তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি ভাবিলেন—জীবনরক্ষার জন্য চুরি করিলে ত দোষ হয় না। এই মাংস চুরি করা যাক।

রাত্রিবেলায় তিনি মাংস চুরি করিতে চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু চুরি করিবার সময় চণ্ডালের হাতে ধরা পড়িয়া গেলেন। চণ্ডাল তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন—"ওহে, আমি ঋষি বিশ্বামিত্র, ক্ষুধার জ্বালায় তোমার মাংস চুরি করতে এসেছি, আমাকে ক্ষমা করো।"

চণ্ডাল তাঁহার পরিচয় পাইয়া সসম্মানে বলিল—"আপনাকে চিনতে পারিনি, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। কিন্তু আপনি কেনই বা আমার ঘর থেকে নিষিদ্ধ অপবিত্র মাংস হরণ করলেন?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"ক্ষুধার জ্বালায় তোমার মাংস চুরি করলাম, মানে মানে তা নিয়ে চলে যেতে দাও।"

চণ্ডাল বলিল—"আপনি পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ, মহর্ষি, আপনাকে এই অভক্ষ্য মাংস খেতে দিতে পারি না।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমার কাছে এখন সকল মাংসই সমান। যে খাদ্য আমি পেয়েছি তাই খাব, কুকুরের মাংসই এখন আমার কাছে অমৃততুল্য।"

চণ্ডাল বলিল—"তবে আপনার সঙ্গে আমার আর কি তফাৎ রইল? ক্ষুধার তাড়না দমন করতে না পারলে আর আপনার ঋষিত্ব কোথায়?"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ সত্যই কিছু নেই। তোমার মত আমারও ক্ষুধাতৃষ্ণা সমান প্রবল, তুমি যদি কুকুরের মাংস খেতে পার, আমিও অসঙ্কোচে তা খেতে পারব না কেন? তবে আমি চুরি ক'রে তোমার কষ্টে আহৃত খাদ্য নিয়ে যাচ্ছি—সেজন্য তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।"

এই বলিয়া চণ্ডালকে তর্কে পরাস্ত করিয়া বিশ্বামিত্র সেই কুকুরের মাংস রন্ধন করিয়া নিজে খাইবার পূর্ব্বে দেবগণকে যজ্ঞ করিয়া অর্পণ করিলেন।

দেবতারা বিশ্বামিত্রের তপোবলে চণ্ডালগৃহে উপস্থিত হইয়া সেই কুকুরের মাংস গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন মন্ত্রবলে সেই নিষিদ্ধ মাংসকে অমৃতে পরিণত করিলেন।

বিশ্বামিত্র কিন্তু সদর্পে বলিলেন—"তোমরা আর আমি কেবল অমৃত খাবো, আর সমস্ত জীব অনাহারে মারা যাবে, তা চলবে না। আগে সকল জীবের খাদ্যাভাব দূর কর, পরে ঐ অমৃত ভোজন করতে পাবে।"

ইন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি সত্বরই অন্নাভাব দূর করিবেন

তখন বিশ্বামিত্র সেই অমৃতে পরিণত কুকুরের মাংস দেবতাগণকে নিবেদন করিয়া নিজে ভোজন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত হইল, পৃথিবী শীতল হইল। বৃক্ষলতায় ফলপুষ্পের উদ্গম হইল, পৃথিবী শ্যামল তৃণে ভরিয়া গেল। সুবর্ষার ফলে পৃথিবীতে প্রচুর শস্য হইল। মানুষের অন্নাভাব থাকিল না। এইভাবে কুকুরমাংস রাঁধিয়া দেবগণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া বিশ্বামিত্র সৃষ্টিরক্ষা করিলেন।

বিশ্বামিত্রের তপোবনে তাড়কা রাক্ষসী ও তাহার পুত্র মারীচ বড়ই উপদ্রব করিতেছিল। বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, রাক্ষসদের উপদ্রবে আমাদের তপোবনে যাগযজ্ঞ বন্ধ হ'তে চলেছে। আপনি রামলক্ষ্মণকে আমার সঙ্গে দিন। তাদের বীরত্বের খ্যাতি আমি শুনেছি।"

রামলক্ষ্মণের বয়স তখন ষোল বছরও পূর্ণ হয় নাই। দশরথ বলিলেন—"মহর্ষি, রামলক্ষ্মণ নিতান্ত ছেলেমানুষ, তারা কি ক'রে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? আমিই আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

বিশ্বামিত্র তাহাতে কুপিত হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনি বুড়ো হয়েছেন, আপনার ক্ষমতা নেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার। আপনার কোন ভয় নেই। আমার কথা না রাখলে আপনার মঙ্গল হবে না।" এই বলিয়া বিশ্বামিত্র অভিশাপের ভয় দেখাইলেন। দশরথ বাধ্য হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছায় রামলক্ষ্মণকে ঋষির সঙ্গে পাঠাইলেন।

বিশ্বামিত্র পথে রাম ও লক্ষ্মণকে মন্ত্রপূত অস্ত্রাদি দান করিলেন এবং বলা ও অতিবলা বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। এই বিদ্যা লাভ করিয়া তাঁহারা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা ও শ্রান্তি ইত্যাদি জয় করিতে পারিতেন। রামলক্ষ্মণ তাড়কা রাক্ষসী, তাহার পুত্র সুবাহু ও

তাহার অনুচর রাক্ষসদের বধ করিলেন। তাড়কার আর এক পুত্র মারীচ পলাইয়া গেল। তপোবনের উপদ্রব বন্ধ হইলে বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে গৌতমের আশ্রমে লইয়া গেলেন। সেখানে রামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া গৌতমের পত্নী অহল্যার অভিশাপমুক্তি হইল। তারপর বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে রাজর্ষি জনকের গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া জনকের কন্যা সীতাকে বিবাহ করিলেন। বিশ্বামিত্রই রামচন্দ্রের সহিত সীতার মিলন ঘটাইলেন।

দেশে দেশে ব্রহ্মক্ষত্র বিশ্বহোত্রী বিশ্বামিত্র
তব জাগরণ,
তব ঋক্‌মন্ত্রে রথী সুপ্রতরা স্রোতস্বতী
বিজিত ভুবন।
আজো গায়ত্রীর সহ অতিবলা বিদ্যা কহ
তরুণ-শ্রবণে,
সত্যশিব শূর-সতী মিলনের প্রজাপতি
রাজর্ষি ভবনে।

[রামায়ণ, স্কন্দপুরাণ, কূর্মপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, বামনপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি সকল পুরাণেই বিশ্বামিত্রের কোন-না-কোন জীবনকথার উল্লেখ আছে।]

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র ছিলেন কান্যকুব্জের রাজা। একবার বিশ্বামিত্র সৈন্যসামন্ত লইয়া যুদ্ধ জয় করিয়া রাজধানীতে ফিরিবার পথে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। ঋষিকে দর্শন করিয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। বিশ্বামিত্রকে অতিথিরূপে পাইয়া বশিষ্ঠ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন। বিশ্বামিত্র কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলে বশিষ্ঠ বলিলেন—"মহারাজ, আজ আমার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করুন।" বিশ্বামিত্র বলিলেন—"মহর্ষি, আমার সঙ্গে এত সৈন্যসামন্ত, আপনি বনবাসী তপস্বী, আপনি কি ক'রে তাদের আহারাদির ব্যবস্থা করবেন?" বশিষ্ঠ বলিলেন—"চিন্তা নেই মহারাজ, কোন প্রকারে ভগবানের কৃপায় সে ব্যবস্থা হবে।"

বিশ্বামিত্র ভাবিলেন,—ঋষি নিশ্চয়ই তপোবলে একটা কিছু বিরাট কাণ্ড ঘটাইবেন! বশিষ্ঠের তপোবলের পরীক্ষা করিবার জন্য বিশ্বামিত্র আশ্রমে থাকিয়া গেলেন।

বশিষ্ঠ তপস্যা করিয়া শবলা নামে একটি কামধেনু পাইয়াছিলেন। এই গাভীটির কাছে বশিষ্ঠ যাহা কিছু চাহিতেন—সঙ্গে সঙ্গে পাইতেন। আজ বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন—"তুমি রাজার ও তাঁহার সৈন্যসামন্তদের রাজভোগ্য খুব উৎকৃষ্ট খাদ্যসকল প্রসব কর।"

শবলা তখন রাশি রাশি সুখাদ্য প্রসব করিতে লাগিল। রাজা ও তাঁহার সঙ্গের লোকজন পেট ভরিয়া তৃপ্তির সহিত আহার করিলেন। শবলা তাহাদের জন্য উৎকৃষ্ট পালঙ্ক ও শয্যা প্রসব করিল। সকলে তাহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করিল।

রাজার কিন্তু শয়ন করিয়া কিছুতেই নিদ্রা হইল না। রাজা ভাবিতে লাগিলেন—কি করিয়া শবলাকে আত্মসাৎ করা যায়! ঋষির প্রতি তাঁহার ভক্তি বরাবরই ছিল—তারপর সে রাত্রির এই কাণ্ড দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গিয়াছেন। এখন চিন্তা, এই ঋষির কাছ হইতে কি করিয়া শবলাকে অধিগত করা যায়। অনেক ভাবিয়া রাজা স্থির করিলেন—আমি ত অতিথি, অতিথি কিছু প্রার্থনা করিলে তাহা না দিলে পাপ হয়। আমি চাহিলেই ঋষি নিশ্চয়ই শবলাকে দিতে বাধ্য হইবেন।

প্রভাত হইবামাত্রই বিশ্বামিত্র ঋষির কাছে বিদায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—"মহর্ষি, আমার একটি প্রার্থনা আছে—দয়া করে যদি পূরণ করেন।" বশিষ্ঠ বলিলেন—"স্বচ্ছন্দে বলুন, এতে আর সঙ্কোচ কেন?" বিশ্বামিত্র বলিলেন—"মহর্ষি, আমাকে আপনার ঐ শবলা গাভীটি দিতে হবে। আপনি বনবাসী তপস্বী, আপনার কিছুতেই প্রয়োজন নেই। আপনি ওটিকে নিয়ে কি করবেন? আমি রাজা, আমি ওটিকে পেলে পৃথিবীর অনেক মঙ্গল সাধন করতে পারব। বহুলোক প্রতিপালন করতে পারব।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"মহারাজ, এই প্রার্থনাটি করবেন না। এটিই আমার সম্বল, আমার দুগ্ধঘৃত ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই; কিন্তু আমার বহু সন্তানসন্ততি আছে—তাদের জন্য শবলার বিশেষ প্রয়োজন।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"আমি আপনার সন্তানগণের জন্য এক লক্ষ গাভী, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, এমন কি একটি রাজ্যই ছেড়ে দিতে রাজী আছি—আপনি ওটিকে দিন।"

বশিষ্ঠ বলিলেন—"মহারাজ, ওটিকে আমি তপস্যার দ্বারা পেয়েছি। তপস্যা ছাড়া আপনি ত ওকে পেতে পারেন না। ওকে যদি আপনি নিয়ে যান—তা হলে ওটি আর কামধেনু থাকবে না—সাধারণ গাভী হয়ে যাবে। আপনার কোন তপস্যা নেই—আপনি প্রার্থনা করলে শবলা আপনাকে কিছুই দেবে না। ওকে নিয়ে আপনার কোন লাভ হবে না।"

বিশ্বামিত্র কিছুতেই শুনিলেন না—তিনি লোভে এমনি অন্ধ যে, ঋষির প্রতি তাঁহার ভক্তিও বিদায় হইল—কোন যুক্তিও তিনি শুনিলেন না। তিনি তাঁহার সৈনিকদের আদেশ দিলেন শবলাকে জোর করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতে।

বশিষ্ঠ নিরুপায় হইয়া শবলাকে বলিলেন—"মা, তুমি আত্মরক্ষা কর।" শবলা ঋষির আদেশ পাইয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিল—আর তাহার দেহ হইতে শত শত সৈনিক নানা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া বিশ্বামিত্রের সৈন্যসামন্তের সঙ্গে লড়াই করিতে লাগিল। যুদ্ধে বিশ্বামিত্রের পুত্রগুলি নিহত হইল—সৈন্যসামন্তও ধ্বংস পাইল। বিশ্বামিত্র ভাবিয়া দেখেন নাই—যে কামধেনু ক্ষীরসন্দেশ প্রসব করে, সে বীর সৈনিক ও তীর-ধনুকও প্রসব করিতে পারে।

বিশ্বামিত্র বুঝিলেন, তপস্যার বলের কাছে কোন বলই লাগে

না—তখন রাজধানীতে না ফিরিয়া তিনি তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাদেব তপে সন্তুষ্ট হইয়া সম্মুখে আসিয়া বলিলেন—"বৎস, তুমি কি চাও?" বিশ্বামিত্র বলিলেন—"প্রভু, আমাকে এমন অস্ত্রবল দিন—যেন যুদ্ধে আমাকে কেউ পরাস্ত করতে না পারে।" মহাদেব "তথাস্তু" বলিয়া দিব্যাস্ত্রসমূহ দান করিলেন। বিশ্বামিত্র শিবের বরে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়া বশিষ্ঠকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমে আগুন ধরাইয়া বিশ্বামিত্র হুঙ্কার করিয়া বলিলেন—"আনো, ঋষি এবার তোমার শবলাকে, শবলা কত সবলা দেখা যাক্!" হুঙ্কার শুনিয়া বশিষ্ঠ বাহিরে আসিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বধ করিবার জন্য অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। বশিষ্ঠ এবার শবলাকে সৈন্যসামন্ত প্রসব করিতে বলিলেন না। কারণ, তিনি বুঝিলেন এবার বিশ্বামিত্রকে ঠেকাইতে তাহারা পারিবে না। নিজে ব্রহ্মদণ্ডের সাহায্যে বিশ্বামিত্রের সকল অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র এবারও পরাস্ত হইলেন।

বিশ্বামিত্র এবার দেখিলেন—ব্রহ্মবলই সবচেয়ে বড় বল। ব্রাহ্মণ হইবার জন্য বিশ্বামিত্র আবার তপস্যায় গেলেন। বহুদিন তপস্যার পর ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন—"বৎস, বর লও।" বিশ্বামিত্র বলিলেন—"প্রভু, আমাকে বশিষ্ঠের মত মহর্ষি করে দিন। আর কিছু চাই না।" ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস, তুমি তপস্যা করেছ—তোমাকে রাজর্ষি করে দিলাম। ব্রহ্মর্ষি হতে অনেক দেরি। ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহঙ্কার দূর না হলে কেউ ব্রহ্মর্ষি হয় না।"

বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইবার জন্য আবার তপস্যায় যাইবেন ভাবিতেছেন—এমন সময় সূর্যবংশের রাজা ত্রিশঙ্কু আসিয়া ঋষির

চরণে কাঁদিয়া পড়িলেন। ত্রিশঙ্কু বলিলেন—"আমি সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার জন্য যজ্ঞ করতে চেয়েছিলাম—কুলগুরু বশিষ্ঠকে অনুরোধ করলাম, তিনি রাজী হলেন না। তাঁর পুত্রদের কাছে গেলাম, তাঁরা আমাকে পাগল বলে দূর করে দিলেন। আমি তাঁদের বেশ দুকথা শুনিয়ে দিলাম। তাতে তাঁরা আমাকে 'চণ্ডাল হও' বলে অভিশাপ দিলেন। আমি আপনার কাছে তাই ছুটে এলাম। আপনাকে এই যজ্ঞে পুরোহিত হতে হবে।"

বিশ্বামিত্র বলিলেন—"তাই ত! আমি ত যজ্ঞে ব্রতী হতে পারি না, আমি যে তপস্যায় যাচ্ছি।"

ত্রিশঙ্কু বলিলেন—"আমি তাঁদের বললাম—তোমরা অভিশাপই দাও আর যাই কর—বিশ্বামিত্রকে দিয়ে এই যজ্ঞ করিয়ে সশরীরে স্বর্গে যাবই।"

তাতে তাঁরা বললেন—"যেমন যজমান, তেমনি যাজক! যেমন চণ্ডাল রাজা, তেমনি পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয় পুরোহিত! চমৎকার যজ্ঞ হবে!"

এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন—"বটে! এত বড় আস্পর্দ্ধা! আচ্ছা, আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব। আমার তপস্যার বল যে কত, তা একবার দেখাচ্ছি। তুমি যজ্ঞের আয়োজন কর।"

বিশ্বামিত্র যজ্ঞ শেষ করিয়া ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে পাঠাইলেন। ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের তপের তেজে স্বর্গে গেলেন বটে, কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহারা বলিলেন—চণ্ডালের স্বর্গে ঠাঁই নাই। ত্রিশঙ্কু নামিতে লাগিলেন—বিশ্বামিত্র বলিলেন—"ঐখানে থাক।" ত্রিশঙ্কুর পতন হইল না—স্বর্গে গমনও হইল না, মাঝখানে আকাশে ত্রিশঙ্কু থাকিয়া গেলেন।

বিশ্বামিত্র তখন ত্রিশঙ্কুকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া নূতন স্বর্গ সৃষ্টি করিবার জন্য আবার তপস্যায় গেলেন। দেবতারা ইহাতে ভীত হইয়া বিশ্বামিত্রকে প্রসন্ন করিলেন। ত্রিশঙ্কু নক্ষত্র হইয়া আকাশেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্র নূতন স্বর্গসৃষ্টির কল্পনা ত্যাগ করিলেন। ক্রমে তাঁহার চিত্তের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তপস্যা করিতে করিতে তাঁহার মন হইতে রাগ, হিংসা, দম্ভ, লোভ ইত্যাদি সব দূর হইয়া যাইতে লাগিল—নিজের তুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহার মনে অনুতাপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মা তাঁহার এই নূতন ধরণের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলেন। এবার বিশ্বামিত্রকে বর চাহিতে হইল না। ব্রহ্মা বলিলেন—"বৎস, এইবার তুমি ব্রহ্মর্ষি হইলে।" বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়া প্রথমেই বশিষ্ঠের আশ্রমে গিয়া বশিষ্ঠের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করিলেন—ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র কাঁদিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বহুদিনকার বিবাদ মিটিয়া গেল।

[বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কথা দেবীভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। এই দ্বন্দ্ব অবলম্বনে গিরিশচন্দ্র 'তপোবল' নামে নাটক ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'বাল্মীকির জয়' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন]

জড়ভরত

পূর্ব্বকালে ভরত নামে এক মনুবংশীয় রাজা ছিলেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। বহুকাল ন্যায়ধর্ম্ম অনুসারে প্রজা পালন করিয়া পরম ভাগবত ভরত পুত্র সুমতির হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পুলহাশ্রমে হরিক্ষেত্রে (শালগ্রাম তীর্থে) গমন করিয়া তপস্যায় রত হইলেন। একদিন তিনি নদীতে স্নান করিতেছিলেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন—একটি সিংহ একটি হরিণীকে তাড়া করিল। হরিণীটি গর্ভবতী ছিল। হরিণীটি লাফ দিয়া যেমন পলাইতে যাইবে, অমনি তাহার গর্ভ হইতে একটি শাবক প্রসূত হইয়া জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া ভরতের মন বিচলিত হইল। তিনি হরিণশাবকটিকে উদ্ধার করিয়া যজ্ঞকুণ্ডের আগুনে সেক দিয়া বাঁচাইলেন। তার পর হরিণশাবকটিকে তিনি সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে হরিণশাবকটি বনের মধ্যে চরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ভরত হরিণশাবকটিকে সন্তানের মত ভালবাসিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে ভরত হরিণশিশুকে নিজের বুকে রাখিয়া ঘুমাইতেন, শাবকটি একটু নড়িলে চড়িলেই তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত।

ভরত প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে শাবকটির জন্য নীবারকণা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। শাবকটিকে খাওয়াইয়া তিনি তপজপে বসিতেন, ধ্যানের সময় তিনি দুটি চোখ একসঙ্গে বুজিতে পারিতেন না। একটি চোখ শাবকটির দিকে চাহিয়া থাকিত। শাবকটি একটু দূরে চরিতে গেলে ভরত একটি দণ্ড হাতে সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন—পাছে কোন বন্য জন্তু তাহাকে আক্রমণ করে! নিজ হাতে তিনি শাবকটিকে স্নান করাইতেন। হরিণশাবকের সেবাতেই তাঁহার সারাদিন কাটিয়া যাইত। হরিণের প্রতি ভরতের মমতা এতই বাড়িয়া গেল যে, তিনি জপতপ সব ভুলিয়া গেলেন।

এই অবস্থার একটি বর্ণনা দিয়াছেন শরৎচন্দ্র তাঁহার 'চন্দ্রনাথ' নামক উপন্যাসে—"সেই মৃগশিশু পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে দিনে দিনে তাঁহার ছিন্ন স্নেহডোর আবার গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল, সে শতভগ্ন মায়াশৃঙ্খল তাঁহার চারিপাশে জড়াইয়া দিতে লাগিল। সেই মৃগশিশু তাঁহার নিত্যকর্ম্ম পূজাপাঠ এমন কি ঈশ্বরচিন্তার মাঝে আসিয়াও অংশ লইয়া যাইত। ধ্যান করিবার সময় তিনি মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেন সেই নিরাশ্রয় পশুশাবকের সজল করুণ দৃষ্টি তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। সে বড় হইতে লাগিল। ক্রমে কুটির ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া পুষ্পকাননে, তাহার পর অরণ্যে, ক্রমে সুদূর অরণ্যপথে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া বেড়াইত। ফিরিয়া আসিবার নির্দ্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলে রাজা ভরত উৎকণ্ঠিত হইতেন। তখন ডাকিতেন 'আয় আয় আয় আয়!'

"একদিন সে তাঁহার আজন্মজড়িত স্নেহবন্ধন নিমেষে ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল। মানুষের ব্যথা বুঝিল না। বৃদ্ধ ভরত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—'আয় আয় আয়।' কেহ আসিল না। কেহ সে ব্যাকুল আহ্বানের উত্তর দিল না। তখন সমস্ত অরণ্য অন্বেষণ করিলেন। প্রতি কন্দরে, প্রতি বৃক্ষতলে, প্রতি লতাবিতানে কাঁদিয়া ডাকিলেন—'আয় আয় আয়।' একদিন দুইদিন তিনদিন কাটিয়া গেল, কেহ আসিল না।

"প্রথমে তাঁহার আহারনিদ্রা বন্ধ হইল। পূজাপাঠ উঠিয়া গেল। তাহার পর ধ্যান চিন্তা সবই নিরুদ্দেশ স্নেহাস্পদের পিছে পিছে অনুদ্দেশ পথে পথে ছুটিয়া ফিরিতে লাগিল। মৃত্যুর কালো ছায়া ভূলুণ্ঠিত ভরতের অঙ্গ অধিকার করিল, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।"

মৃত্যুকালে হরিণের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভরত প্রাণত্যাগ করিলেন। ফলে মৃত্যুর পর ভরত হরিণশাবক-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। হরিণজন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন। সেজন্য তাঁহার সেই শূন্য আশ্রমের চারি পাশেই ঘুরিয়া বেড়াইতেন। হরিণজন্মের অবসান হওয়ার পর ভরত আবার আঙ্গিরস গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই জন্মেও তিনি জাতিস্মর ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে সংসারে বিরাগী হইয়া থাকিতেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখদুঃখ, শীততাপ কিছুতেই কাতর হইতেন না। তাঁহার ভ্রাতৃবধূরা যখন যাহা খাইতে দিত, তাহাই তিনি খাইতেন। তাহারা অনেক সময় তিরস্কার করিত, গালাগালি করিত, তিনি কোন উত্তর দিতেন না। তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের গলগ্রহ ছিলেন। কখনও তাঁহার ক্রোধ হইত না। তিনি সর্ব্বদা মৌনী হইয়া থাকিতেন—একটি কথাও বলিতেন না। এজন্য তাঁহাকে জড়ভরত বলা হইত।

লোকে তাঁহাকে খাটাইয়া লইত, অম্লান বদনে তিনি খাটিয়া যাইতেন। মান-অপমান বোধ তাঁহার ছিল না। সুখদুঃখে তিনি নির্ব্বিকার থাকিতেন। শীতগ্রীষ্ম সব কালেই অনাবৃত দেহে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই সময়ে কতকগুলি দস্যু তাহাদের দেবীর নিকট বলিদান দিবার জন্য একটি লোককে বাঁধিয়া আনে। লোকটি কোন উপায়ে বন্ধন ছিন্ন করিয়া পলায়ন করে। দস্যুরা খুঁজিতে খুঁজিতে ভরতকে দেখিতে পায়। তাহারা ভরতকেই ধরিয়া লইয়া যায় বলিদান দিবার জন্য। দেবীর কৃপায় ভরত সে যাত্রা রক্ষা পান।

জড়ভরত সারাদিন শ্রীভগবানের ধ্যান করিতেন। একদিন তিনি ছিন্নবস্ত্র পরিয়া পথের ধারে গাছের তলায় বসিয়া আছেন, এমন সময় পাল্কী চড়িয়া সিন্ধুসৌবীর দেশের রাজা রহূগণ যাইতেছিলেন। একজন বাহক পীড়িত হওয়ায় পাল্কী বহিতে অন্য বাহকদের কষ্ট হইতেছিল। রাজা ভরতকে বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া পাল্কী বহিতে নিযুক্ত করিলেন। ভরত পাল্কী বহিয়া চলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ভরতকে বলিলেন—"ওহে, তুমি এঁকে বেঁকে চলছ কেন?" ভরত এইবার প্রথম কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—"রাজন্, পথে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট দেখছি, পাছে তাদের জীবননাশ হয়, এই ভয়ে আমি তাদের বাঁচিয়ে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছি। জীবহত্যা মহাপাপ।" এই বলিয়া তিনি রাজাকে অনেক ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝাইলেন। রাজা বুঝিতে পারিলেন—ইনি একজন মহাপুরুষ। তিনি ভরতের পায়ে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। এই ঘটনার পর ভরত বেশী দিন ইহসংসারে ছিলেন না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভরতের মুক্তি হইয়া গেল।

[বিষ্ণুপুরাণ]

"পুরাকালে ছিল শুনি অগস্ত্য নামেতে মুনি
এমনই শক্তির অবতার,
জীবের মঙ্গল তরে যাহা ইচ্ছা মনে করে
কিছুই অসাধ্য নাহি তার।
দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ কারেও করে না লক্ষ্য
দেহ মনে হেন শক্তি ধরে,
বিপদে পাইয়া ভয় যে তার শরণ লয়
তারেই সে পরিত্রাণ করে।"

[যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চি]

হাজার হাজার বছর আগে এ দেশে অগস্ত্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তিনি কঠোর তপস্যা করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে দেব দানব মানব সকলেই ভয়ও করিত যত—ভক্তিও করিত তত।

অগস্ত্য ভাবিয়াছিলেন, তিনি সংসারী হইবেন না—তপজপ লইয়া জীবন কাটাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। একদিন তিনি দেখেন; পিতৃপুরুষগণ বৃক্ষ হইতে অধোমুখে ঝুলিতেছেন। অগস্ত্য তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন—"অগস্ত্য, শুনলাম তুমি সঙ্কল্প করেছ বিবাহ করবে না। শুনে আমরা বড় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। তুমি বিবাহ না করলে আমাদের বংশ থাকবে না, আমরা পিণ্ডজলের অভাবে স্বর্গে ঠাঁই পাব না। সেই ভয়ে আমাদের এই দশা।" অগস্ত্য বাধ্য হইয়া বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন।

অগস্ত্য বিদর্ভদেশের রাজার কাছে কন্যা প্রার্থনা করিলেন। যাহার ঘরবাড়ী নাই, বনের কুটীরে যে বাস করে, ফলমূল খায়, গাছের বাকল পরে, তপজপ লইয়া থাকে, তাহার হাতে কন্যাদান করিতে কোন বাপেরই ইচ্ছা হয় না। কিন্তু অগস্ত্যের তপস্যার তেজ এমন ভীষণ যে, রাজা ভয়ে ভয়ে কন্যা লোপামুদ্রাকে ঋষির হস্তে অর্পণ করিলেন। লোপামুদ্রা কিন্তু অগস্ত্যের মতন ঋষির গৃহিণী হইতে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। হাসিতে হাসিতে বাকল পরিয়া তিনি অগস্ত্যের সঙ্গে তপোবনে চলিয়া গেলেন।

বিবাহ করিয়া অগস্ত্য গৃহী হইলেন। গৃহী হইলেই অর্থের প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ লোপামুদ্রা একবার কিছু গহনা চাহিয়া বসিলেন। অগস্ত্য শ্রুতর্ব্বা, ত্রসদস্যু ইত্যাদি রাজার কাছে ধনলাভের জন্য গেলেন। যখন তিনি শুনিলেন—তাঁহাদের আয়ব্যয় সমান, তখন তিনি তাঁহাদের বলিলেন—"আমাকে কোন ধনকুবেরের কাছে নিয়ে চল।"

তাঁহারা তখন মণিমতিপুরীর রাজা ইল্বলের নাম করিলেন। তিনি শুনিলেন—ইল্বল নামে এক দানব প্রচুর ধন দিব বলিয়া ঋষি ও

ব্রাহ্মণদের নিজের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিত। সে এক ঋষির সেবা করিয়া পুত্রবর প্রার্থনা করিয়াছিল। ঋষি দেখিলেন—ইল্বল বড়ই দুর্জ্জন, তাহার পুত্র হইলে সে হয়ত আরও দুর্জ্জন হইবে। তিনি ইল্বলকে বর না দিয়া অভিশাপ দিলেন—"তুমি অপুত্রক হও।"

সেই হইতে ইল্বল ঋষি ও ব্রাহ্মণের মহাবৈরী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বাতাপি নামে এক ভাই ছিল—সে ইচ্ছামত মেষ বা ছাগের রূপ ধরিতে পারিত। ইল্বল যাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত, তাহাকে প্রচুর মাংস খাওয়াইত। বাতাপি মেষ বা ছাগল রূপ ধরিলে তাহাকে কাটিয়া তাহারই মাংস রান্না করিয়া অতিথিকে খাওয়ানো হইত।

তার পর ইল্বল "বাতাপি, কোথায় তুমি? বাইরে এস" বলিলেই সে অতিথির পেট চিরিয়া বাহির হইত। এইভাবে ইল্বল বহু ঋষি ও তপস্বীর প্রাণ হরণ করিত। দানবদের মহাশত্রু হইল দেবতারা, আর ঋষিরা দেবতাদের উপাসক ও অনুগত। ইল্বল সেজন্য ঋষিদের বধ করিয়া আনন্দ পাইত।

অগস্ত্য জানিয়া শুনিয়া ইল্বলের গৃহে অতিথি হইলেন এবং বাতাপির মাংসে ক্ষুধা দূর করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ইল্বল প্রাণপণে বাতাপিকে ডাক দিতে লাগিল। আর বাতাপি? সে ঋষির তেজে তখন হজম হইয়া গিয়াছে। ইল্বল ভয় পাইয়া অগস্ত্যের পায়ে ধরিল। অগস্ত্য বলিলেন—"দেখ, আর কখনও মুনিঋষির কোন ক্ষতি করবে না, প্রতিজ্ঞা কর। নতুবা তোমারও রক্ষা নেই।" ইল্বল শপথ করিয়া স্বীকৃত হইল এবং অগস্ত্যকে প্রচুর অর্থ দান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল।

এ হেন অগস্ত্য ঋষির অনুগত শিষ্য ছিল বিন্ধ্য পর্ব্বত। এই পর্ব্বতটি ভারতবর্ষের মাঝে থাকিয়া ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত

করিয়াছে। যেমন গুরু, তাঁহার শিষ্যও তেমনি। বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক কাণ্ড বাধাইল। বিন্ধ্য একদিন সূর্য্যকে বলিল—"দেখ,তুমি সুমেরু পর্ব্বতের চারিদিকে ঘোরো,আমি সুমেরু হতে কম কিসে? আমার চারপাশেও তোমাকে ঘুরতে হবে।"

সূর্য্য বলিলেন—"সে কি কথা! আমি ত নিজের ইচ্ছায় ঘুরি না,—বিধাতার আদেশেই ঘুরি। সুমেরু হলো দেবতাদের পর্ব্বত, তার চারদিকে ঘুরি বলেই তোমার চারদিকেও ঘুরব, সেই বা কেমন কথা? এ তোমার বড় অসঙ্গত আবদার।"

বিন্ধ্য অগস্ত্যের শিষ্য, তাহার তেজ গুরুর তেজের মতই। সে রাগিয়া গিয়া ক্রমাগত উঁচু হইয়া ক্রমে সূর্য্যচন্দ্রের ভ্রমণপথ রোধ করিয়া দিল। দেবতারা প্রমাদ গণিলেন—তাঁহাদের সৃষ্টি রসাতলে যায়। তাঁহারা অগস্ত্যের শরণ লইয়া বলিলেন—"প্রভু, রক্ষা করুন। আপনার শিষ্য সূর্য্যের গতিরোধ করেছেন। আপনি ছাড়া এ বিপদে উপায় নেই।" অগস্ত্য দেবতাদের অভয় দিয়া বিন্ধ্যের কাছে আসিলেন। বিন্ধ্য গুরুকে দেখিয়া মাথা নোওয়াইয়া প্রণাম করিল। অগস্ত্য আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি তোমাকে পার হয়ে দক্ষিণ দেশে যাচ্ছি, যত দিন ফিরে না আসি, ততদিন এই ভাবেই থাক।"

"অবনত নমস্কারে মাথা নোয়াইয়া তারে
করে গিরি তপস্বীর পথ,
'তিষ্ঠ তিষ্ঠ নত শিরে যাবৎ না আসি ফিরে'
কহে ঋষি; প্রণত পর্ব্বত
সম্মতির বাক্য ধরি' সেই মাথা নত করি'
আছে অগস্ত্যের পথ চাহি';
তপনের চলে কার্য্য বুদ্ধিতে জিনিল আর্য্য,
আর্য্যধর্মে বিঘ্ন আর নাহি।" [যতীন্দ্রমোহন]

অগস্ত্য দক্ষিণ দেশে গেলেন,—আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যেরও আর মাথা তোলা হইল না। অগস্ত্য কৌশলে গুরুভক্ত শিষ্যকে দমন করিয়া দেবতাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ভাদ্র মাসের ১লা তারিখে অগস্ত্য দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া আর ফিরেন নাই। সেজন্য এদেশের হিন্দুরা কোন মাসের পয়লা তারিখে বাড়ী হইতে অন্যত্র যায় না।

অগস্ত্য সম্বন্ধে এমনই আরও অনেক গল্প আছে। আর একটি গল্প এই—

ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রাসুর নিহত হইলে কালেয় নামে একদল অসুর সমুদ্রে আশ্রয় লইয়াছিল। তাহারা দেবতাদের বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহারা পরাস্ত হইয়া পলাইত—দেবতাগণ পাছে পাছে তাড়া করিলে সমুদ্রের মধ্যে গিয়া লুকাইত। রাত্রিকালে ইহারা সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঋষিদের তপোবনে গিয়া যজ্ঞের আগুন নিভাইয়া দিয়া আসিত, তাঁহাদের কুটীরে আগুন ধরাইয়া দিত, আরও নানাপ্রকার উপদ্রব করিত। ইহারা একবার বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ১৯৭ জন ব্রাহ্মণ তাপসকে ও ১০০ জন ঋষিকে এবং ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া ১০০ জন তাপসকে হত্যা করে। দেবতারা ও ঋষিরা অগস্ত্যের শরণ লইলেন। অগস্ত্য বলিলেন—"দাঁড়াও, আমি সমুদ্রের জল সব শুষে খাচ্ছি, কোথায় অসুররা আশ্রয় নেয়, দেখছি।"

এই বলিয়া অগস্ত্য সমুদ্রের জলে নামিয়া সমুদ্রের জল সমস্ত পান করিয়া ফেলিলেন। অসুররা সব নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল। তাহারা আর লুকাইবার ঠাঁই পাইল না। দেবতারা সহজেই তাহাদিগকে বধ করিয়া ফেলিলেন।

অগস্ত্য সকলের পরিত্রাতা ছিলেন, কখনও কাহাকেও অভিশাপ দিতেন না। কেবল রাজা নহুষকে তিনি অভিশাপ দেন। রাজা নহুষ অগস্ত্য ইত্যাদি কয়েকজন ঋষিকে দিয়া শিবিকা বহাইয়া তাহাতে চড়িয়া চলিয়াছিল এবং দ্রুত চলিবার জন্য অগস্ত্যকে কশাঘাত করিয়াছিল। ইহাতে অগস্ত্যের ধৈর্য্য-চ্যুতি হয়। অগস্ত্য নহুষকে অভিশাপ দেন—"তুমি অজগর সর্প হয়ে বহু সহস্র বৎসর বনে বিচরণ কর।" 'অগস্ত্যের অভিশাপে নহুষ সর্প হইল।

এইরূপ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কাহিনী এই ঋষিদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের পুরাণে আছে।

[অগস্ত্যের কাহিনী রামায়ণ, বামনপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মহাভারত, দেবীভাগবত ইত্যাদি পৌরাণিক গ্রন্থে আছে।]

দুর্ব্বাসার কাহিনী

সতীশিরোমণি অনসূয়ার গর্ভে অত্রির তিন পুত্রের জন্ম হয়—সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসা। ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় ও রুদ্রের অংশে দুর্ব্বাসার জন্ম। দুর্ব্বাসা যাঁহার গৃহে গমন করিতেন তাঁহার অতিথি-সৎকারে সামান্য একটু ত্রুটি হইলেই অভিশাপ দিতেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপ সাংঘাতিক। হাতে পায়ে ধরিয়াও ঋষিকে প্রসন্ন করা যাইত না।

ওর্ব্ব ঋষির কন্যা কন্দলীকে দুর্ব্বাসা বিবাহ করেন। বিবাহের সময়ে ঋষি বলেন—"কন্যার একশত অপরাধ ক্ষমা করতে হবে।" দুর্ব্বাসা তাহাতে রাজী হন। কন্দলী কথায় কথায় কলহ করিত।

অল্পদিনের মধ্যেই একশত অপরাধ পূর্ণ হইয়া গেল। তখন দুর্ব্বাসা তাহাকে অভিশাপ দিয়া ভস্ম করিলেন।

ইন্দ্রের শ্রীভ্রংশের মূলে দুর্ব্বাসা

দুর্ব্বাসা একবার পৃথিবীভ্রমণ করিতে করিতে এক বিদ্যাধরীর হাতে একটি সন্তানকপুষ্পের মালা দেখিতে পান। ঋষি মালাটি তাহার হাত হইতে চাহিয়া লইয়া নিজে গলায় পরিয়া স্বর্গের দিকে চলিলেন। পথে দেখিলেন ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া আসিতেছেন। ইন্দ্রকে দেখিয়া মালাটি গলা হইতে খুলিয়া ইন্দ্রের দিকে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রের কাছে সন্তানকের মালার কোন মূল্য নাই। তাঁহারই নন্দন-কাননে বারোমাস সন্তানক ফুটিয়া থাকে। ইন্দ্র মালাটিকে ঐরাবতের গলায় ঝুলাইয়া দিলেন। ঐরাবত শুঁড় দিয়া মালাটি লইয়া পায়ের তলায় ফেলিয়া দলিত করিয়া চলিয়া গেল। দুর্ব্বাসা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের মালার পরিণতি দেখিলেন। তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—"তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও।" স্বর্গ হইতে লক্ষ্মী বিদায় লইয়া সমুদ্রগর্ভে চলিয়া গেলেন। দৈত্যরা আসিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। স্বর্গের দুর্দ্দশার অবধি থাকিল না। সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতারা লক্ষ্মীকে আবার উদ্ধার করিয়া আনিলেন। সমুদ্র-মন্থনের মূলে দুর্ব্বাসা।

শকুন্তলার পতিবিরহের মূলে দুর্ব্বাসা

দুর্ব্বাসার হাতে দুর্ব্বলা নারীও অব্যাহতি পাইত না। সূর্য্য-বংশের রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের তপোবনে শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে চলিয়া গেলেন। তার পর বহু দিন অতীত হইল। দুষ্মন্তের কোন সংবাদই না পাইয়া শকুন্তলা গালে হাত

দিয়া দুষ্মন্তর কথা ভাবিতেছিলেন। এমন সময় দুর্ব্বাসা আসিলেন 'অয়মহং ভোঃ' বলিয়া গর্জ্জন করিয়া। শকুন্তলা এমনি তন্ময়ী হইয়াছলেন যে, দুর্ব্বাসার আগমনের কথা বুঝিতে পারেন নাই। দুর্ব্বাসা ক্রোধে অভিশাপ দিলেন—"তুই যার কথা ভাবছিস, মনে পড়িয়ে দিলেও সে তোকে চিনতে পারবে না।" শকুন্তলার সখী, একথা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া ঋষির চরণে পড়িয়া বলিল—"আপনার অবলা কন্যার উপর রাগ করবেন না—আমি পাদ্য-অর্ঘ্য নিয়ে আসছি। শকুন্তলা বড় দুঃখিনী—বড় অসহায়া—তাকে ক্ষমা করুন।" দুর্ব্বাসা বড়ই কঠোর প্রকৃতির ঋষি, কিন্তু নারীর আবেদনে তাঁহার মন গলিল। তিনি বলিলেন—"যা বলেছি, তা ত ফিরবে না। যদি কোন অভিজ্ঞান দেখাতে পারে, তবে রাজা চিনতে পারবে।" সখী অনেকটা আশ্বস্ত হইল—কারণ, দুষ্মন্তের দেওয়া একটা অঙ্গুরী শকুন্তলার কাছে ছিল, ভাবিল,—তাহাই দেখাইলে চলিবে।

[এই কাহিনী মহাভারতে নাই। এই কাহিনী সম্ভবতঃ মহাকবি কালিদাসের পরিকল্পিত। তার পর ইহা পদ্মপুরাণে গৃহীত হইয়াছে]

লক্ষ্মণবর্জ্জনের মূলে দুর্ব্বাসা

রামায়ণের রামলীলার শেষ হইয়াছিল দুর্ব্বাসার দ্বারা। কালপুরুষ আসিয়াছিলেন রামের সঙ্গে গোপনে কিছু বলিবার জন্য। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে দ্বারে বসাইয়া রাখিলেন—কেহ যেন ঐ সময়ে রামের রাজসভায় প্রবেশ করিতে না পারে। লক্ষ্মণ সকলকেই বিদায় করিয়া দিলেন, সকলেই কারণ বুঝিয়া চলিয়া গেল। এমন সময় দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। দুর্ব্বাসা বলিলেন—"আমি এক্ষণি রামের সঙ্গে দেখা করতে চাই।" লক্ষ্মণ

কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিলেন—"আপনি দয়া করে বশিষ্ঠদেবের গৃহে একটু অপেক্ষা করুন—কালপুরুষের সঙ্গে দাদার গোপনীয় কথা হচ্ছে। তিনি চলে গেলে আপনাকে নিয়ে যাব।"

দুর্ব্বাসা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি অপেক্ষা করব না। যদি এক্ষণি দেখা করতে না দাও—তা হলে সমস্ত অযোধ্যা শাপের অনলে দগ্ধ করব।' লক্ষ্মণ কি করেন, তিনি রামচন্দ্রকে দুর্ব্বাসার আগমন জানাইলেন। কালপুরুষের সঙ্গে কথা ছিল—তাঁহার সঙ্গে রামচন্দ্রের কথাবার্ত্তার সময় কেহ যদি সেখানে উপস্থিত হয়, রামচন্দ্র তবে তাহাকে ত্যাগ করিবেন। রামচন্দ্রকে দুর্ব্বাসার জন্যই বাধ্য হইয়া লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে হইল। লক্ষ্মণ সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র আর পৃথিবীতে থাকিতে চাহিলেন না। ভ্রাতৃদ্বয় সহ রামচন্দ্র সরযূর জলে দেহত্যাগ করিলেন। এইখানেই রামায়ণের শেষ।

যদুকুল ধ্বংসের মূলে দুর্ব্বাসা

একবার দুর্ব্বাসা দ্বারকার পথে চলিতেছিলেন—যাদববালকগণ পথের ধারে খেলা করিতেছিল। যাদব বালকদের অনুরোধে কৃষ্ণপুত্র সাম্ব মুষল পেটে বাঁধিয়া নারীবেশে ঋষির সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর, বল দেখি আমার কি সন্তান হবে এবং কবে সন্তান হবে?" দুর্ব্বাসাকে যাদববালকরা চিনিত না। দুর্ব্বাসা বুঝিলেন, বালক তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুর্ব্বাসা বলিলেন—"তোর পেটে মুষল জন্মাবে, সেই মুষলে যদুকুল ধ্বংস পাবে। জানিস আমি কে? আমি দুর্ব্বাসা।" দুর্ব্বাসার নাম শুনিয়া তাহাদের চৈতন্য হইল। তাহারা তখন সেই মুষলটাকে

ঘসিয়া ঘসিয়া গুঁড়া করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। সেই গুঁড়াগুলি হইতে নলখাগড়ার বনের জন্ম হইল। অভিশাপ ঐ নলখাগড়ার মধ্যেই থাকিয়া গেল।

তার পর বহু বৎসর অতীত হইয়া গেল। দুর্ব্বাসার শাপের কথা কাহারও মনে থাকিল না। সেদিনকার যাদব বালকগণ এখন প্রৌঢ়। তাহারা একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নিজেদের মধ্যে মারামারি সুরু করিল। ঐ নলখাগড়াগুলি তুলিয়া পরস্পরকে মারিতে লাগিল। ঐ গুলির স্পর্শ পাইবামাত্র সকলে প্রাণহীন হইয়া পড়িল। এইভাবে মারামারি করিয়া যদুকুল ধ্বংস পাইল। তাহা হইতে কথা হইয়াছে—'মুষলং কুলনাশনম্'।

এই যদুকুল দুর্ব্বাসার শ্বশুরকুল। যদুবংশেই দুর্ব্বাসা দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। যদুবংশীয়া পত্নীটিকে প্রথমা পত্নীর মত শাপে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না।

কুন্তীকে বর প্রদান

দুর্ব্বাসা শুধুই শাপ দেন নাই—এক-আধবার বরও দিয়াছেন। তিনি বর দিয়া একবার অনর্থও ঘটাইয়াছিলেন। একবার দুর্ব্বাসা কুন্তীভোজ রাজার গৃহে অতিথি হন। কুন্তীভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী (পৃথা) খুবই যত্নের সহিত দুর্ব্বাসার সেবা-পরিচর্য্যা করেন।

দুর্ব্বাসা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে বর দেন এবং একটি মন্ত্র শিখাইয়া দেন। এই মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেবতাকে স্মরণ করিলে তিনি পতিরূপে উপস্থিত হইবেন। মন্ত্রটি ঠিক খাটে কিনা, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য কুন্তী অবিবাহিতা অবস্থাতেই সূর্য্যদেবকে স্মরণ করেন—সূর্য্যদেবের বরে কর্ণের জন্ম হয়। এজন্য কুন্তীর দুর্ভোগ কম হয় নাই—কর্ণের দুর্গতিও কম হয় নাই।

ব্রাহ্মণকে বরদান

আর একবার দুর্ব্বাসা এক উঞ্ছবৃত্তিক ব্রাহ্মণকে স্বর্গলাভের বর দেন। একজন ব্রাহ্মণ ক্ষেতের ধানযব কুড়াইয়া আনিয়া শস্য-সঞ্চয় করিতেন এবং তাহার সামান্য কিছু অংশে জীবনধারণ করিয়া প্রতি অমাবস্যায় যজ্ঞ করিয়া ঐ সঞ্চিত খাদ্যে ঋষিদের ভোজন করাইতেন। দুর্ব্বাসা সন্ধান পাইয়া প্রতি অমাবস্যায় ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া একাই সব ভোজন করিয়া চলিয়া যাইতেন। ব্রাহ্মণ তাহাতে বিরক্ত না হইয়া ঋষিকে মাসে একবার ভোজন করাইতেন। এই ভাবে বৎসরকাল ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিয়া দুর্ব্বাসা ব্রাহ্মণকে বর দিলেন—"স্বর্গলাভ কর।"

যথাসময়ে দেবদূত স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্য আসিল।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তোমার স্বর্গরথে চড়বার আগে আমি স্বর্গের গুণের কথা শুনতে চাই।"

দেবদূত স্বর্গের গুণ বর্ণনা করিল।

দেবদূত বলিলেন—"স্বর্গের প্রধান দোষ—পুণ্যের বলে স্বর্গ-লাভ হয় বটে, কিন্তু এই পুণ্যক্ষয় হলেই আবার মনুষ্যজন্মলাভ করতে হয়। স্বর্গ চিরদিনের জন্য নয়।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"দেবদূত, রথ নিয়ে ফিরে যাও, আমি এমন স্বর্গ চাই না। দু'দিনের স্বর্গে আমার কাজ নেই। আমি এমন লোকে যেতে চাই—যে লোক হতে আর মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয় না।"

ব্রাহ্মণ দুর্ব্বাসার বর গ্রহণ না করিয়া তপস্যা করিতে বনে চলিয়া গেলেন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মুক্ত হইলেন।

কাম্যকবনে দুর্ব্বাসা

দুর্ব্বাসা দশ হাজার শিষ্য লইয়া কিছুকালের জন্ম দুর্য্যোধনের অতিথি হইলেন। দুর্য্যোধন নিজে ঋষির চরণসেবা করিতে লাগিলেন, শিষ্যগণের ভুরিভোজনের জন্ম ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল। শিষ্যগণ ত বনের ফলমূল খাইয়া বিরক্ত ও নীরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, রাজভোগ পাইয়া তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিল।

দুর্ব্বাসা তুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন—"তোমার কি অভীষ্ট সাধন করব বল।"

দুর্য্যোধনের মনে এক চিন্তাই জাগিতেছিল—কিরূপে পাণ্ডবদের নিধন করা যাইবে। দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন—

"মহাত্মন্! যদি আপনি আমার ইষ্ট সাধন করতে চান—তবে একটি কথা রাখতে হবে। কাম্যকবনে পাণ্ডবগণ বাস করছে। আপনি রাত্রি দশদণ্ডের পর পাণ্ডবদের আশ্রমে এই দশ হাজার শিষ্য সঙ্গে উপস্থিত হয়ে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর ধর্ম্মনিষ্ঠার ও আতিথেয়তার পরীক্ষা করুন। আমার এই একমাত্র নিবেদন, আপনার কাছে আর কিছু চাই না।"

দুর্য্যোধন অনায়াসেই এই নির্লজ্জ প্রস্তাব করিলেন, আর আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্ব্বাসা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াও স্বীকৃত হইলেন। দুর্য্যোধনের উদ্দেশ্য—অতিথিসেবা করিতে না পারিয়া দুর্ব্বাসার অভিশাপে পাণ্ডবগণ ধ্বংস পাক।

সশিষ্য দুর্ব্বাসা রাত্রি দশদণ্ডের পর যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাত্মন্! দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

পরীক্ষা করিতে হইলেই মিথ্যাকথা বলিতে হয়। দুর্ব্বাসা মিথ্যাকথাই বলিলেন,—কহিলেন—"হস্তিনাপুরে গিয়ে কিছুদিন

কুরুরাজের অতিথি হয়েছিলাম। দুর্য্যোধন ভৃত্যের মত আমার যথেষ্ট সেবা করেছে। তার পর মনে হলো—তোমরা কেমন আছ একবার দেখে যাই। তুমি আহারের আয়োজন কর, আমি প্রভাসতীর্থে সন্ধ্যাবন্দনা সেরে আসি।" এই বলিয়া তিনি সশিষ্য সন্ধ্যাবন্দনার জন্য চলিয়া গেলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির মহাচিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। কিরূপে রাত্রির মধ্যে এতগুলি লোকের অন্নসংস্থান হইবে? দ্রৌপদীর কাছে গিয়া যুধিষ্ঠির বিপদের কথা জানাইলেন। দ্রৌপদী ভাবিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তা ত—কৃষ্ণচিন্তা। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তাঁহার অন্য শরণ্য কেহ নাই; তিনি প্রাণ ভরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখীর প্রার্থনা শুনিলেন। তিনি স্মরণমাত্র উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদীর রন্ধনস্থালীর গাত্রে লিপ্ত একটি শাক ও একটি কণা অন্ন নিজে ভক্ষণ করিলেন—তাহাতেই দুর্ব্বাসার শিষ্যগণের ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া গেল। তাঁহাদের আর নড়িবার শক্তিও থাকিল না। তখন দুর্ব্বাসার দুরভিসন্ধি নাসিকা-গর্জ্জনে পরিণত হইল।

শেষ পর্য্যন্ত দুর্ব্বাসার দর্পচূর্ণ

অম্বরীষ ছিলেন একজন সূর্য্যবংশীয় রাজা। তাঁহার হরিভক্তির তুলনা ছিল না। তিনি একবার একবৎসর ধরিয়া একটি ব্রত গ্রহণ করেন। বৎসরান্তে তিন দিবস উপবাস করিয়া চতুর্থ দিবসে বিধিমত দানধ্যান করিয়া তিনি পারণা করিতে যাইবেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা ঋষি আসিয়া উপস্থিত। দুর্ব্বাসা অতিথি হইলেন,—অতিথি সৎকার না করিয়া রাজা পারণা করিতে পারেন না। দুর্ব্বাসা নদীতে স্নানের জন্য গেলেন, সন্ধ্যা হইয়া গেল—তখনও দুর্ব্বাসা ফিরিলেন না। এদিকে রাজার ব্রতভঙ্গ হয়। তিনি

অম্বরীষ ঋষির উপদেশে বিষ্ণুপাদোদক গ্রহণ করিলেন। এমন সময় দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত। রাজা জলগ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া দুর্ব্বাসা ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তিনি রাগিয়া একগাছা জটা ছিঁড়িয়া মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন। সেই জটা হইতে এক দৈত্যের আবির্ভাব হইল।

দৈত্য অম্বরীষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুর চক্র আসিয়া দৈত্যকে বধ করিল এবং দুর্ব্বাসাকে বধ করিতে ধাবিত হইল। দুর্ব্বাসা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন—চক্রও পিছু পিছু ছুটিল। ত্রিভুবন ঘুরিয়া দুর্ব্বাসা কোথাও আশ্রয় পাইলেন না।

শেষে দুর্ব্বাসা রাজা অম্বরীষেরই শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন—"মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন—ক্ষমা করুন।" অম্বরীষ বলিলেন—"ঋষিবর, বিনা কারণে আমাকে বধ করতে চেয়েছিলেন। যাই হোক, আপনাকে আশ্রয় দিলাম। আর কখনও হরিভক্তের উপর অত্যাচার করবেন না।" অম্বরীষের প্রার্থনায় বিষ্ণুচক্র বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল।

ইহার পর দুর্ব্বাসা বোধ হয় অনেকটা সংযত হইয়া চলিতেন।

[দুর্ব্বাসার কথা মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, শিবপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ইত্যাদি বহু পুরাণেই আছে। দুর্ব্বাসাকে ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মসংযম ইত্যাদির পরীক্ষার প্রতীক মনে করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত কবিতায় সেই কথাই বলা হইয়াছে।]

কোথা যাজ্ঞিক আজি আনমনে ভুলেছ নিত্য যাগ,
কোথা ঋত্বিক করনি সাধন আপন কর্ম্মভাগ।
কোথায় শিষ্য ভুলেছ ভাষ্য মাধবীর সৌরভে,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ব্বার বেগে অবহিত হও সবে।

কোথা ঋষিবালা পুষিছ মর্ম্মে মোহারুণ কামনায়,
অতিথি আসিয়া ফিরে যায় তবু হয় না চেতনা তায়।
তরুলতাগুলি পায়নি পানীয় হরিণী শষ্পদল,
দুর্ব্বাসা আসে দুর্ভাষা মুখে, কোথায় পাদ্য-জল ?

কোথা নরপতি লালসা-লালিত, পুষ্পবাটিকা-মাঝে,
বিলাসে ব্যসনে আছ সারা বেলা হেলা করি রাজকাজে ?
কোথা শূরবর ভুলেছ সমর প্রেয়সীর কর ধরি,
দুর্ব্বাসা আসে, দুর্ব্বলচিত ! জাগো মোহ পরিহরি।

ভুলি দেব দ্বিজ পূজা-ব্রত নিজ জনমের তিন ঋণ,
কোথা গৃহী হায় শফরী-লীলায় কাটাতেছ নিশিদিন ?
কোথা বধূ গৃহধর্ম্ম ভুলেছ বিরহের বেদনায় ?
দুর্ব্বাসা আসে জাগো জাগো সবে নিজ নিজ সাধনায়।

আসিছে মূর্ত্ত রুদ্রশাসন ভ্রূকুটিকুটিল মুখ,
শিরে জটাবন, নয়নে দহন, শ্মশ্রুগহন বুক।
সাধনার ভার বহ আপনার মোহের আঁধার নাশি,
জাগ্রত রহ, উগ্র তাপস কখন পড়িবে আসি।

(পর্ণপুট, ১ম ভাগ)

নারদ ও পর্ব্বত ঋষির কাহিনী

নারদ বিষ্ণুর পরম ভক্ত। যাত্রার অভিনয়ে নারদের মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকের ধারণা হইয়াছে নারদ বুঝি চিরদিনই বুড়া, তাঁহার মুখে লম্বা লম্বা পাকা দাড়ি, মাথায় লম্বা চুল। নারদ যে একদিন তরুণ যুবক ছিলেন, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। এই নারদের একদিন বিবাহ করিবার ইচ্ছাও হইয়াছিল। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর কাছে গিয়া নারদ বিবাহের অনুমতি চাহিলেন এবং একটি সুন্দরী পাত্রীর সন্ধানও জানিতে চাহিলেন। বিষ্ণু বলিলেন—"অযোধ্যার রাজা অম্বরীষের একটি সুন্দরী কন্যা আছে। নারদ, তুমি গিয়ে সেই রাজার কাছে কন্যা প্রার্থনা কর।"

পর্ব্বত নামে আর একজন তরুণ ঋষিও বিষ্ণুর ভক্ত ছিলেন। তাঁহারও বিবাহের ইচ্ছা হইলে বিষ্ণুর কাছে তিনি একটি সুপাত্রীর সন্ধান জানিতে চাহিলেন। বিষ্ণু তাঁহাকেও অম্বরীষ রাজার কন্যার কথা বলিলেন।

নারদ অম্বরীষের গৃহে গিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার

প্রস্তাব জানাইলেন। অম্বরীষও ছিলেন বিষ্ণুর পরম ভক্ত। তিনি নারদকে খুবই আদর করিয়া বলিলেন—"ঋষিবর, আপনি দুই দিন পরে আসবেন। আমি মহিষী ও কন্যা শ্রীমতীর সঙ্গে এবিষয়ে একটু আলোচনা করি।" নারদ দুইদিন পরেই আসিবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

তারপর আসিলেন পর্ব্বত ঋষি। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের গৃহে তাঁহারও খুব সমাদর হইল। পর্ব্বত ঋষি কন্যা প্রার্থনা করিলে রাজা বলিলেন—"কিছুক্ষণ আগে নারদ এসে কন্যা প্রার্থনা করে গেছেন। তাঁকে দু'দিন পরে আসতে বলেছি। আপনিও দু'দিন পরে আসবেন। দুইজনেই আপনারা সমান রূপবান যুবক। কন্যা আপনাদের দু'জনের মধ্যে যাঁকে পছন্দ করবেন, তাঁরি গলায় কন্যা মালা দেবেন।"

নাবদকে জানানো হইল—পর্ব্বত ঋষিও কন্যাকে বিবাহ করিতে চান। দু'জনেই যোগ্য পাত্র। কন্যা দু'জনের মধ্যে যাঁহাকে পছন্দ করিবেন, তিনিই হইবেন রাজার জামাতা।

এই সংবাদ পাইয়া নারদ বিষ্ণুর কাছে গিয়া প্রার্থনা জানাইলেন—"প্রভু, পর্ব্বত ঋষি গিয়েও যে রাজার কাছে কন্যা প্রার্থনা করেছেন। অম্বরীষের কন্যা দু'জনের মধ্যে যাঁকে পছন্দ করবে, তাঁরি গলায় মালা দেবে। আপনি মায়াজাল বিস্তার করে একটা উপকার করুন। পর্ব্বতের মুখখানা শ্রীমতীর চোখে যেন বানরের মুখ বলে মনে হয়।"

বিষ্ণু হাসিয়া বলিলেন—"তাই হবে নারদ, তাই হবে।"

পর্ব্বত ঋষিও আসিয়া বিষ্ণুর কাছে ঐরূপ প্রার্থনাই জানাইলেন। বিষ্ণু তাঁহাকেও বলিলেন—"তাই হবে, পর্ব্বত।" পর্ব্বত নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে অম্বরীষ বড় বিপদে পড়িলেন। শ্রীমতী যাঁহার গলায় মালা দিবেন না—তিনিই রাগ করিয়া অভিশাপ দিবেন। এখন উপায় কি? তখন অম্বরীষ ও শ্রীমতী দুই পিতাপুত্রীতে প্রাণপণে নারায়ণকে ডাকিতে লাগিলেন—"প্রভু, এ সঙ্কটে রক্ষা করুন।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে দুই ঋষিই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইজনে দুই সিংহাসনে বসিলেন। দুই ঋষির হাঁকডাকে কন্যাকে মাল্যহস্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সভায় আসিতে হইল। কন্যা চক্ষু বুজিয়া নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কন্যা দেখিলেন দুই সিংহাসনে দুইটি বানর বসিয়া আছে। কন্যা বানর দুইটির গলে মাল্য দিতে পারিলেন না। কি করিবেন ভাবিতেছেন—এমন সময়ে দুইজনের মাঝখানে দেখিলেন—একজন অসামান্য রূপবান তরুণ যুবক। তাঁহার গায়ের রঙ নবদূর্ব্বাদলের মত, তাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ। শ্রীমতী এই পুরুষের গলায় মাল্য দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীমতীকে আর দেখিতে পাওয়া গেল না। পর্ব্বত ও নারদ দুইজনেই অবাক হইয়া চাহিয়া দেখেন—কন্যা নাই।

তাঁহারা প্রথমে অম্বরীষকে খুব গালাগালি করিলেন—বলিলেন, "কন্যা কোথায় সরালে, বলো।" অম্বরীষ বলিলেন—"কন্যা আপনাদের চোখের সম্মুখ হতে কোথায় গেল আমি ত বুঝতে পারছি না। বোধ হয় এটা বিষ্ণুমায়া। আপনারা সন্ধান করুন।"

ঋষি দুইজনে দেখিলেন—"সত্যই ত! কই, কন্যা ত তাঁদের সম্মুখ হতে কোথাও যায়নি!"

তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুকে সব কথা বলিলেন। বিষ্ণু মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"প্রভু, নিশ্চয় এটা তোমার মায়া! তুমিই কন্যা হরণ করেছ।"

বিষ্ণু বলিলেন—"নারদ! পর্ব্বত! তোমরা ভুল করছ। আমিই

তোমাদের সন্ধান দিয়েছিলাম শ্রীমতীর। আমি নিজে যদি কন্যা হরণ করতাম—তা হলে তোমাদের সন্ধান দেব কেন? তুমি অম্বরীষের কাছে গিয়ে খোঁজ নাও কন্যা মনে মনে কাউকে বরণ করেছে কিনা—সে হয়ত মায়াবী পুরুষ। আর তা ছাড়া, তোমাদের মুখটি ত মাল্যলাভের সময় বানরের মুখের মত দেখতে হয়েছিল।”

নারদ বলিলেন—“সে কি! পর্ব্বতের মুখখানাই ত বানরের মুখের মত দেখাবার কথা।” বিষ্ণু বলিলেন—“হাঁ, তোমার প্রার্থনাতে তাই হয়েছিল। কিন্তু পর্ব্বতও আমার পরম ভক্ত। তারও প্রার্থনা ছিল। কাজেই তোমার মুখখানাও বানরের মত দেখতে হয়েছিল যে। শ্রীমতীর অপরাধ কি? সে ত বানরের গলায় মালা দিতে পারে না। যাও, তোমরা অম্বরীষের কাছে খোঁজ লওগে, কন্যা কাউকে মনে মনে বরণ করেছিল কিনা।”

পর্ব্বত বলিলেন—“আমি তপস্যায় চললাম। আমার বিয়ের সাধ মিটে গেছে। যাও নারদ, তুমি খোঁজ করগে।”

নারদ অম্বরীষের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“রাজন্, তোমার কন্যা কাকে মনে মনে বরণ করেছিল, বলো। নতুবা তোমার রক্ষা নেই।”

অম্বরীষ বলিলেন—“দেবর্ষি, কন্যা কাকে মনে মনে বরণ করেছিল, তা আমি কি করে জান্‌ব? আপনি প্রসন্ন হোন। আমার গৃহে আরও সুন্দরী কন্যা অনেক আছে। আপনি যতগুলি কন্যা ইচ্ছা বিয়ে করতে পারেন। আপনার জন্য আমি আমার কন্যাটিকে হারালাম। তার প্রতিকার কি বলুন।”

নারদ কুপিত হইয়া বলিলেন—“তুমিই সব জান। আমি অভিশাপ দিচ্ছি—তোমাকে মোহের অন্ধকার আচ্ছন্ন করুক—তোমার জ্ঞানবুদ্ধি সব লোপ পাক।”

নারদ এই অভিশাপ দিবামাত্র একটা অন্ধকারের আবর্ত্ত রাজাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য ধাবিত হইল। "হে নারায়ণ, রক্ষা কর"—বলিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বিষ্ণুচক্র আসিয়া সেই অন্ধকারের আবর্ত্তের পথ রোধ করিল। তখন সেই আবর্ত্ত বিষ্ণুচক্রের দ্বারা তাড়িত হইয়া নারদের দিকে ধাবিত হইল।

নারদ তখন প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন—অন্ধকারের আবর্ত্ত নারদের পিছু পিছু ছুটিল। নারদ ত্রিভুবনময় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মলোকে, ইন্দ্রলোকে, শিবলোকে—নারদ কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। তখন শেষে বৈকুণ্ঠে গিয়া বিষ্ণুর চরণতলে আছড়াইয়া পড়িলেন।

তখন মোহের আবর্ত্ত ও বিষ্ণুচক্র দুইই অন্তর্হিত হইল। নারদ কাঁদিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন বলিলেন—"নারদ, শোনো। শ্রীমতী মনে মনে আমাকেই পতিত্বে বরণ করেছিল। তুমি ও পর্ব্বত যখন শ্রীমতীর মাল্যলাভের আশায় বসে ছিলে—তখন আমি দ্বিভুজরূপে ধনুর্ব্বাণ হাতে তরুণ যুবার রূপ ধরে তোমাদের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলাম—তোমরা আমাকে দেখতে পাওনি। কিন্তু শ্রীমতী দেখতে পেয়েছিল। শ্রীমতী আমার গলাতেই মালা দিয়েছিল। আমি তখনই শ্রীমতীকে হরণ করে নিয়ে এসেছি।"

নারদ বলিলেন—"প্রভু, তাই যদি তোমার অভিপ্রায় ছিল, তবে আমাকে এত ভোগালে কেন?"

বিষ্ণু বলিলেন—"তুমি জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে—তোমার নিজের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। তুমি পর্ব্বতকে শ্রীমতীর চোখে বানর বানাতে চেয়েছিলে, তারই শাস্তি ভোগ করলে। যাও, এখন অম্বরীষের

গৃহে ফিরে গিয়ে তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর। আর তাঁর রাজপুরীর অন্য কোন কন্যাকে বিয়ে করগে।"

নারদ বলিলেন,—"প্রভু, আমার বিয়ের সখ মিটে গেছে। আমি আর বিয়ের নামও করব না। চিরকুমার হয়ে থাকব। কিন্তু আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি—যে মূর্ত্তিতে তুমি আমাকে ছলনা করলে, সেই মূর্ত্তিতে অম্বরীষের বংশে তোমাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। তোমার শ্রীমতীকেও নারীজন্ম লাভ করতে হবে। তোমার শ্রীমতীকে রাক্ষসে হরণ করে নিয়ে যাবে, তোমাকে বনে বনে তার জন্য কেঁদে বেড়াতে হবে। আর আমাকে তুমি বানর বানিয়েছিলে, সেই বানরের সাহায্য নিয়েই শ্রীমতীকে উদ্ধার করতে হবে। মোহের অন্ধকার তোমাকে আচ্ছন্ন করবে—তুমি ভুলে যাবে যে তুমি নারায়ণ। আমি চললাম।"

[অদ্ভুত রামায়ণ ও লিঙ্গপুরাণ]

ব্রহ্মা যোগবিদ্যাবলে যে নয়জন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, অত্রি তাঁহাদের অন্যতম। অত্রি ব্রহ্মার নয়ন হইতে আবির্ভূত হন। ইঁহার পত্নী সতীদের অগ্রগণ্যা অনসূয়া। রামচন্দ্র 'বনবাস-কালে অত্রির আশ্রমে এক দিন বাস করেন। চিত্রকূটে রামের মন টিকিল না। তিনি সেখান হইতে অত্রির আশ্রমে গেলেন। অত্রি রামচন্দ্রকে নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। তিনিই অনসূয়ার পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি বহুবর্ষ তপস্যা করিয়া তাপসগণের তপোবিঘ্ন নিবারণ করেন। এক সময় দশ বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি হইয়াছিল, ইনিই তপঃপ্রভাবে ফলফুল ও শস্যের সৃষ্টি করেন। এক সময় মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষিপত্নীকে রাত্রিপ্রভাতে বিধবা হইবে বলিয়া অভিশাপ দেন, ইনি তপঃপ্রভাবে সে অভিশাপ ফলিতে দেন নাই।

অনসূয়া এখন অতিবৃদ্ধা, তাঁহার গাত্রচর্ম্ম শিথিল, মুখ দন্তহীন, কেশ শুভ্রবর্ণ। জানকী ইঁহাকে প্রণাম করিলে জানকীকে ইনি কোলের কাছে টানিয়া লইয়া সতীত্বের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। হিতাহিত জ্ঞান আছে—তুমি সকল বিষয়ে পতির অনুব্রতা হয়ে চলবে"

পরে অনসূয়া সীতাকে বলিলেন—"বৎসে, তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর।" সীতা বলিলেন—"আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্না হয়েছেন তাতেই আমি ধন্য হয়েছি—আমি অন্য কোন বর চাই না।" অনসূয়া ইহাতে আনন্দিত হইয়া সীতাকে বস্ত্র, মাল্য, অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ দিলেন—সেগুলি কখনও ম্লান হইবে না।

এক সময়ে কামদ বনে পত্নী অনসূয়ার সহিত অত্রিমুনি বাস করিতেন। অনসূয়া ছিলেন পতিব্রতাদের আদর্শ। একবার দেশে দারুণ অনাবৃষ্টি হইল। বহু বৎসর ধরিয়া এই অনাবৃষ্টি চলিতে লাগিল। বনের গাছপালা সব শুকাইয়া গেল—জীবজন্তু সব মরিয়া গেল। আশ্রমের শিষ্যগণ পলাইল। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। অত্রি বলিলেন,—"আমি ধ্যানে বসলাম, দেখি দেবতাদের প্রসন্ন করতে পারি কি না!" অনসূয়া শিবমূর্ত্তি গড়িয়া শিবের পূজা করিতে এবং নিজে উপবাসী থাকিয়া প্রাণপাত করিয়া স্বামিসেবা করিতে লাগিলেন। দারুণ গ্রীষ্ম, সারা দিনরাত অনসূয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। বহু দিন এই ভাবে কাটিয়া গেল,—বৃষ্টি হয় না। অনসূয়া মহাদেবকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলেন। অনসূয়ার আহ্বানে মহাদেব ও গঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনসূয়া বলিলেন—"মা গঙ্গা, আমার স্বামীর তপস্যার যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে তুমি এই আশ্রমের

কাছেই থাক।" গঙ্গা বলিলেন, "তোমার স্বামীর তপস্যা তোমার স্বামিসেবার তুলনায় কিছুই নয়, তোমার তপস্যায় মুগ্ধ হ'য়ে আমি এসেছি।" অনসূয়া বলিলেন,—"যদি এসেছেন তবে দয়া করে এই আশ্রমের পাশে থাকুন। এই বনের জীবগণকে রক্ষা করুন।" গঙ্গা বলিলেন, "যদি তুমি তোমার স্বামিসেবার পুণ্য আমাকে দান কর, তবে আমি থাকতে পারি।" অনসূয়া অম্লানবদনে নিজের স্বামিসেবার পুণ্য দান করিলেন।

মহাদেব বলিলেন—"দেবি, বর গ্রহণ কর।" অনসূয়া বলিলেন, "প্রভু, আমার স্বামীর তপস্যায় যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তবে জগতের অনাবৃষ্টি দূর হোক—জীবজগৎ রক্ষা পাক।" মহাদেব বলিলেন—"দেবি, তোমার স্বামির তপস্যায় নয়, তোমার স্বামি-সেবায় ও শিবপূজায় তুষ্ট হয়ে আমি বর দিতে এসেছি। তোমার নিজের সুখসৌভাগ্য, স্বর্গ, মোক্ষ, যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর।"

অনসূয়া বলিলেন—"দেব, আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না—সমস্ত জীবজগৎ অনাবৃষ্টিতে দুঃখ পাচ্ছে। সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ আমি চাই—প্রচুর বৃষ্টি হোক, আবার পৃথিবী পূর্ব্বশ্রী লাভ করুক। আমার স্বামী দারুণ দাহ ও তৃষ্ণায় দুঃখ পাচ্ছেন —তিনি শান্তি লাভ করুন।"

মহাদেব 'তথাস্তু' বলিয়া বিদায় লইলেন।

প্রচুর বৃষ্টি হইল—মেঘগর্জ্জনে অত্রির ধ্যানভঙ্গ হইল। অনসূয়া বলিলেন—"প্রভু, আপনার তপস্যার ফলে মহাদেবের কৃপায় অনাবৃষ্টি দূর হয়েছে।" অত্রি বলিলেন—"আর্য্যে, ইহা সত্য নয়, আমি ধ্যানযোগে জেনেছি—তোমার পাতিব্রত্যের তপস্যাতেই অনাবৃষ্টি দূর হয়েছে। ধন্য দেবি, ধন্য তোমার স্বামিসেবা।"

শ্রীদামসখা

শ্রীদামের ব্রাহ্মণী বলিলেন—"আর ত সংসার চলে না। পড়সীদের কাছে আর কত ভিক্ষে, কত ধার করব, প্রভু? শুনেছি দ্বারকার অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহপাঠী। একবার যাও না তাঁর কাছে। দুঃখের কথা জানাও। একটা কিছু উপায় হবেই।"

শ্রীদাম বলিলেন—"গৃহিণি, বারবার যখন বলছ, তখন না হয় যাচ্ছি একবার! কিন্তু শুধু হাতে ত রাজদর্শন করতে যেতে পারি না। সঙ্গে কিছু দাও।"

শ্রীদামের গৃহিণী পড়সীদের কাছ হতে চারি মুঠা চিড়া ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। ঘরের কোণে একটা পুঁটুলি হইতে একখণ্ড নেকড়া খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাতে ঐ চার মুঠা চিড়া বাঁধিয়া শ্রীদামের সঙ্গে দিলেন।

শ্রীদাম এই উপহার সঙ্গে করিয়া দ্বারকার দিকে চলিলেন,—মনে কত চিন্তা, কত দ্বিধা, কত সংশয়! শ্রীদাম আকাশ-

পাতাল ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনা হইয়া চলিয়াছেন। একবার ভাবিতেছেন,—প্রহরী দ্বারীরা হয়ত কাঙাল দেখিয়া রাজবাড়ীতে ঢুকিতেই দিবে না, আবার ভাবিতেছেন—সে ত অনেক কালের কথা, যখন দুজনে এক গুরুর কাছে পড়িতাম। হয়ত এখন রাজাধিরাজের এই কাঙাল সহপাঠীকে মনেই নাই!

শ্রীদাম দ্বারকায় যখন পৌঁছিলেন—তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, একে মলিন বেশ, পথের ধূলায় তাহা আরো মলিন হইয়াছে। রুক্ষ কেশে একবিন্দু তৈল নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মুখ শুকাইয়া গিয়াছে!

শ্রীদামের ভাগ্য ভালো—দ্বারীকে নিজের পরিচয় দিবামাত্র দ্বারী শ্রীকৃষ্ণের কাছে সংবাদ পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়! রাজভবনে এত সহজে প্রবেশ লাভ! শ্রীদাম স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। যাত্রা শুভ বলিয়াই শ্রীদামের মনে হইল। সংবাদ পাইবা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ দ্বারদেশে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীদামকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন, তারপর আদর করিয়া শ্রীদামের হাত ধরিয়া তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। সেখানে সোনার খাটে শ্রীদামকে বসাইলেন। রুক্মিণী নিজ হস্তে ব্যজন করিতে লাগিলেন। কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে নিজে স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইয়া দিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে পাশে বসাইয়া বহু উপচারে রাজ্যভোগ্য আহার করাইলেন। শ্রীদাম জীবনে সেরূপ খাদ্য কখনও খান নাই।

আহারের পর দুইজনে একাসনে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—"ভাই শ্রীদাম, মনে পড়ে গুরুগৃহের কথা? একদিন আমরা বনে কাঠ কাটতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি এলো, চার দিক অন্ধকার হয়ে এলো। আমরা পথ হারিয়ে

সারা রাত বনে বনে ঘুরলাম। শেষরাত্রে বনের মধ্যে গুরুর কণ্ঠের স্নেহের ডাক শুনলাম—

"সারারাত ধরে বৃষ্টি হচ্ছে—আমরা খুঁজে খুঁজে ব্যাকুল হয়েছি, সারারাত চোখের পাতা বুজতে পারিনি। কোথায় তোরা বাপ, বাড়ী আয়। তোদের গুরু-মা কেঁদে কেঁদে কাতর হয়ে পড়েছে। কাঠে কাজ নেই, তোরা বাড়ী আয়।"

আমরা কিন্তু তখনও কাঠের বোঝা ছাড়িনি। কাঠের বোঝা মাথায় করেই গুরুর সঙ্গে গৃহে ফিরলাম।

শ্রীদাম বলিলেন—"মনে পড়ে বৈকি সখা, কিছুই ভুলিনি।"

এইরূপ নানা কথা হইতে লাগিল। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা বন্ধু, বহু দিন পরে দেখা। তোমার ঘরে কি কিছু ছিল না? কিছুই আমার জন্য আননি? ওকি ও পুঁটুলিতে কি? দেখি দেখি"—এই বলিয়া শ্রীদামের হাত হইতে পুঁটুলিটা কাড়িয়া লইয়া শ্রীকৃষ্ণ পুঁটুলি খুলিয়া এক মুঠা চিঁড়া মুখে পুরিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আর একমুঠা খাইতে যাইতেছেন—এমন সময় রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—

"এক মুঠাতেই অতুল বিভব পাবে এই ব্রাহ্মণ,
কর যদি তুমি দুই মুঠা ভক্ষণ,
তবে চিরদিন লক্ষ্মীর রূপে অধীন হইব তাঁর,
অনেক জন্ম লাগিবে দ্বিজের ভবনদী হতে পার।"

শ্রীদাম সেদিন সোনার খাটে শয়ন করিলেন। যাঁহার ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমাইবার কথা, সোনার খাটে তাঁহার ঘুম আসিবে কেন? তাঁহার সারারাত্রি জাগিয়াই কাটিল।

সকাল বেলায় শ্রীদাম বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিদায়কালে

শ্রীকৃষ্ণ আলিঙ্গন দিলেন, কিন্তু ধনসম্পদ কিছুই দিলেন না। শ্রীদামও লজ্জায় কিছু চাহিতে পারিলেন না।

শ্রীদাম ভাবিতে লাগিলেন—"আমি ত শ্রীকৃষ্ণের আতিথ্যে ধন্য হলাম। কিন্তু গৃহিণীকে গিয়ে কি বলব? শুধু হাতে ফিরে গেলে গৃহিণী কি বলবে?"

ভাবিতে ভাবিতে শ্রীদাম গ্রামে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কুটীর আর খুঁজিয়া পাইলেন না। তিনি দেখিলেন গ্রামের সবই ত ঠিক আছে—ভুল ত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কুটীর গেল কোথা? দেখিলেন,—যেখানে তাঁহার কুটীর ছিল,—সেখানে একটি বিশাল প্রাসাদ। সেখানে প্রহরী দ্বারী বহু দাসদাসী ছুটাছুটি করিতেছে। প্রাসাদের দ্বারের দুই ধারে মঙ্গলকলস ও কদলীবৃক্ষ। তোরণের উপরে বাদ্য বাজিতেছে, শঙ্খধ্বনি হইতেছে, গৃহচূড়ায় শঙ্খচক্রাঙ্কিত পতাকা উড়িতেছে। শ্রীদাম গৃহদ্বারে গিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন—কাহার প্রাসাদ এটি! অথচ ঠিক এইখানেই ত তাঁহার কুটীর ছিল, ঐত পথের ওপারে সেই পদ্মফুলে ভরা পুকুর। তাহার ধারে সেই বুড়া বটগাছটি—ঐ পুকুরের পাড়ে ঠিক সেই গ্রাম্য দেবতার মন্দির! একি স্বপ্ন না মায়া?"

এমন সময় রাজরাণীর বেশে তাঁহার গৃহিণী প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

গৃহিণী সাদরে করিলেন আহ্বান,
এসো এসো প্রভু তব আবেদনে এ যে বন্ধুর দান!
পথে কেন খাড়া? গৃহে এস সত্বর!
জনে ভরে গেছে তোমার ভবন, ধনে ভরে গেছে ঘর।

শ্রীদাম বুঝিলেন এই সব শ্রীকৃষ্ণের দান—মনে পড়িল তাঁহার রুক্মিণী দেবীর কথা।

একমুঠা চিড়াতেই এত সম্পদ্—দুমুঠা যদি শ্রীকৃষ্ণ খাইতেন তাহা হইলে সম্পদের মোহ কাটাইয়া মুক্তিলাভে বহু বিলম্ব হইত। শ্রীদাম ভাবিলেন, এই সম্পদের মোহই কাটাইতে কয় জন্ম লাগিবে কে জানে ?

শ্রীদামগৃহিণী আনন্দে উৎসব করিতে লাগিলেন। শ্রীদাম বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে শ্রীদাম বলিলেন—"গৃহিণি, এই প্রাসাদের আঙিনায় আবার আমাদের কুঁড়ে ঘরখানি তুলতে হবে। আমাদের সেই আগেকার মত জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে। এ প্রাসাদ আমাদের ভোগের জন্য নয়, এটা অনাথ আশ্রম হবে। শ্রীকৃষ্ণ সেই অনাথ-আশ্রমের ভার আমাদের দিয়েছেন। এই কথা মনে রেখ।

এ-সম্পদ ভোগ করলে মুক্তি পেতে বহু জন্ম লাগবে। তুমি রাণী-বেশ ত্যাগ করে আবার সেই জীর্ণ বসনখানি পর—তোমাকে আমি আপন জন মনে করতে পারছি না। আমাদের আর অন্ন-চিন্তা নেই। তাই যথেষ্ট। দেশের অনাথ আতুরদের ডেকে এনে এ প্রাসাদে ঠাঁই দাও—তারাই হোক তোমার সন্তান।"

(শ্রীমদ্‌ভাগবত)

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে নরমেধ যজ্ঞ প্রচলিত ছিল। যজ্ঞে পশুর বদলে মানবসন্তানকেও বলিদান দেওয়া হইত। একবার কোশলদেশে দারুণ অনাবৃষ্টি চলিতেছিল।

হাহাকার উঠে কোশল রাজ্য ভরি'
একটি বিন্দু বর্ষণ নাই দ্বাদশ বর্ষ ধরি'।

মাঠে নাই তৃণ, ঘাটে নাই তরী, গাছে নাই ফুল ফল।
পশুপাখী সব ছেড়ে গেছে দেশ, বাপীকূপে নাই জল।
তপ্ত বাতাস বয় উড়াইয়া শুষ্কপত্র ধূলি,
পুকুরের পাঁক চাটিছে কুকুরগুলি।

শুক্‌না শাখায় কাক ডাকে দিনে রাত্রে পেচক ডাকে।
উড়ে ঘরে ঘরে ঘেয়ো মাছি ঝঁকে ঝাঁকে।
বিদেশ হইতে খাদ্য আসে যা সবার তাহা না মিলে
মরে দেশ তিলে তিলে।

কঙ্কালসার মানুষ ঘুরিছে বৃথা ভিক্ষার ছলে,
দেশের রাজারে ধিক্কারি পলে পলে।

দেশের রাজা অম্বরীষ কি করিয়া রাজ্য বাঁচাইবেন তাহার উপায় খুঁজিয়া পান না। এমন সময় এক ঋষি আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, দেবতারা কুপিত হয়েছেন। তাঁদের প্রসন্ন করুন, মহামরুত্ত যজ্ঞ করে।" মহারাজ অম্বরীষ মহামরুত্ত যজ্ঞের আয়োজন করিলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া গেল। ইন্দ্র ভাবিলেন এত বড় যজ্ঞ নিশ্চয় ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য। তখন তিনি যজ্ঞে উৎসর্গ-করা প্রধান পশুটি হরণ করিয়া লইয়া গেলেন।

যজ্ঞে পশুবলির সময় রাজা দেখিলেন—উৎসর্গ-করা পশুটি নাই। তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন।

রাজপুরোহিত তখন তাঁহাকে বলিলেন—

একটি উপায় আছে।
তা যদি করেন সারা দেশ তবে বাঁচে।
অন্য পশুতে হবে নাক কাজ, বিপ্র বালক চাই।
স্বেচ্ছায় প্রাণ যে করিবে দান, মরণে শঙ্কা নাই—
এখন বিপ্রবালকের পিতামাতা
স্বেচ্ছায় তারে সঁপিলে তোমার হইবে দেশের ত্রাতা।
আরব্ধ যাগ যদি নাহি হয় শেষ।
রাজকুল সনে ধ্বংস পাইবে দেশ।

হারানো পশুর সন্ধানের জন্য রাজা দেশে দেশে বহু লোক পাঠাইলেন, কিন্তু কোথাও পশুর সন্ধান মিলিল না। শেষে তিনি নিজেই যজ্ঞে বধ্য বালকের সন্ধানে বাহির হইলেন। বহু সন্ধানের পর ভৃগুশৃঙ্গ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এখানে ঋচীক নামে এক

ঋষি বাস করিতেন। এই ঋচীক ছিলেন বিশ্বামিত্রের ভগিনী-পতি। রাজা ঋচীকের আশ্রমে গিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া বিপদের কথা বলিলেন। ঋচীক বলিলেন—"আমার নিজের তিনটি ছেলে আছে। একটিকে আমি বিক্রয় করতে পারি।

ধনের মূল্যে বেচিব না ছেলে, একটি পুত্র দিলে
যদি বাঁচে তায় লক্ষ লক্ষ, এ ভাগ্য কার মিলে ?

কোশলের প্রজারা রক্ষা পাবে বলে আমি সন্তান দানে রাজী।"

এত বলি ঋষি তিন পুত্রেরে করিলেন আহ্বান
কহিলেন তিনি, "ব্রহ্মবিদ্যা দান
করিয়াছি আমি, জান ত তোমরা অনিত্য এই দেহ,
জীবজগতের কল্যাণ তরে তোমাদের মাঝে কেহ
প্রস্তুত আছ সঁপিতে আপন প্রাণ ?
জান ত তোমরা নয় আত্মার দেহ সনে অবসান।
যজ্ঞের তরে একটি বালক চান এই নরপতি,
দেবকোপ হতে বিশাল কোশল পাইবে অব্যাহতি।"

মধ্যম পুত্র শুনঃশেফ আগাইয়া আসিয়া বলিল—"রাজন, আমাকে নিয়ে চলুন। ইহা আমার পরম ভাগ্য। আমার তুচ্ছ জীবন দিলে লক্ষ লক্ষ লোকের মঙ্গল হবে। আপনি দেশের রাজা,—বিপদ হতে নিস্তার পাবেন, আমার দরিদ্র মাতা-পিতা ও ভ্রাতাদের দারিদ্র্য-দুঃখ চিরদিনের জন্য ঘুচে যাবে। তুচ্ছ অনিত্য জীবনের বদলে এত মঙ্গল কি সহজে হয় ?"

এই বলিয়া ঋষিকুমার রাজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। কিন্তু উপায় নাই, নিষ্ঠুর আচরণ করিতেই হইল। রাজা ঋচীক মুনিকে এক সহস্র গাভী ও বহু স্বর্ণরত্নাদি দান করিলেন।

রাজা শুনঃশেফকে রথে চড়াইয়া স্বরাজ্যে ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে পুষ্কর-তীর্থে বিশ্রামের জন্য রাজা রথ হইতে নামিলেন। পুষ্কর-তীর্থে বিশ্বামিত্র তখন তপস্যা করিতেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেফের মাতুল। মাতুলকে দেখিয়া ঋষিকুমারের প্রাণের মায়া সঞ্চারিত হইল, তাহার মনে হইল—মাতুলের ত অতুল শক্তি, তিনি হয়ত এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন, যাহাতে রাজার যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তাহার প্রাণও রক্ষা পায়।

শুনঃশেফ সমস্ত কথা মাতুলের কাছে বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের হৃদয় তাহাতে বিগলিত হইল। বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন—

"তোমাদের মাঝে কেহ
প্রস্তুত আছ রাজার যজ্ঞে অর্পিতে নিজ দেহ ?
তোমাদের ভ্রাতা এই বালকের তাহাতে বাঁচিবে প্রাণ,
আর হবে তায় জীবজগতের অনন্ত কল্যাণ।
কেহ শুনঃশেফের বদলে রাজার যজ্ঞে প্রাণ দাও।"

পুত্রগণের মধ্যে কেহই জীবন উৎসর্গ করিতে রাজী হইল না। তখন বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে অভিশাপ দিয়া শুনঃশেফকে বলিলেন—"বৎস, তোমাকে আমি এমন দুইটি ঋক্ মন্ত্র শিখিয়ে দিচ্ছি—যা আবৃত্তি করলে তোমার জীবন রক্ষা হবে। যখন তোমাকে উৎসর্গ করে যুপকাষ্ঠে বেঁধে রাখবে, তখন তুমি পরম ভক্তিভরে এই মন্ত্র দুটি গান করবে। এতে স্বয়ং ইন্দ্র ও অগ্নি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়ে তোমার জীবন রক্ষা করবেন। কোন ভয় নেই বৎস, তুমি যাও। রাজার যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হবে, তুমিও প্রাণে বাঁচবে।"

রাজা শুনঃশেফকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। পরদিন যজ্ঞসমাপ্তির দিন। শুনঃশেফ সারারাত্রি

দেবতাগণকে প্রাণপণে ডাকিতে এবং ঋক্ দুইটি আবৃত্তি করিতে লাগিল। ঋষিকুমারকে বলি দিতে রাজার মন সরিতেছে না। রাজার প্রাণেও শান্তি নাই। কিন্তু উপায় নাই—উৎসৃষ্ট পশুর অভাবে নরবলি দিতেই হইবে।

যথাকালে শুনঃশেফকে স্নান করাইয়া, জবার মালা পরাইয়া ললাটে সিন্দুর ও সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন লেপন করিয়া যূপকাষ্ঠে বাঁধা হইল। শুনঃশেফ ছোট ছোট হাত দুইটি জোড় করিয়া মাতুল-প্রদত্ত মন্ত্র দুইটি উচ্চকণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে গান করিতে লাগিল। মৃত্যু আসন্ন, নিজে যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ, পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছে, দাউ দাউ করিয়া হোমের অগ্নি জ্বলিতেছে—ঘাতক খড়্গ হস্তে দণ্ডায়মান। এমন অবস্থায় অসহায় শিশুর প্রাণে যে আকুল আবেগ উচ্ছ্বসিত হইতেছিল—তাহা কণ্ঠের সুরকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞস্থলের সকলের হৃদয়কেই বিগলিত করিল—সকলের চোখেই জল ঝরিতে লাগিল। শিশুকণ্ঠের আর্ত্তনাদ মন্ত্র সঙ্গীতকে বাহন করিয়া স্বর্গের দিকে উঠিল।

নীরব হইল ঋত্বিক্‌গণ, হোতা আর উদ্গাতা,
আবেশে সবার বুজিল চোখের পাতা।
হোমের অনল হল পিঙ্গল ধূমজাল নিশ্বসি,
অবশ হইল ঘাতক-হস্ত, খড়্গ পড়িল খসি'।
হৃদয়ে হৃদয়ে করুণার ধারা বয়,
সবার অঙ্গ হল রোমাঞ্চময়।

সহসা ইন্দ্রদেব অগ্নিদেবকে সঙ্গে করিয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন—তাঁহার সঙ্গে সেই চুরি-করা যজ্ঞীয় পশু। তিনি আসিয়া শুনঃশেফের বন্ধন মোচন করিয়া সেই পশুটিকে যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া দিলেন। ইন্দ্র শুনঃশেফকে বলিলেন—"বৎস, তুমি আমারই দোষে

প্রাণ হারাতে বসেছিলে। তুমি মহাপ্রাণ, তুমি দেশের রাজার ও প্রজাগণের কল্যাণের জন্য তোমার মাতা, পিতা ও ভ্রাতার সুখ-সৌভাগ্যের জন্য স্বেচ্ছায় জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিলে। তোমার মনে যে প্রাণের মমতা জেগে উঠেছিল—তাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তা যদি না জাগ্‌ত তা হলে তোমাতে আর পশুতে তফাৎ থাকত না। তুমি মহাপ্রাণ,—আজ হতে তোমার নাম হল দেবরাত। আমরা তোমাকে বর দিচ্ছি—তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর এবং তোমার এই কাহিনী জগতে অমরত্ব লাভ করুক।"

ইন্দ্র রাজাকে বলিলেন—"রাজন, তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হোক। শুনঃশেফের প্রসাদে যজ্ঞস্থলে তুমি রক্তমাংসের শরীরেই আমাদের দেখা পেলে।"

বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া শুনঃশেফকে জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন।

[শুনঃশেফের কাহিনী রামায়ণ, ব্রহ্মপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারত ইত্যাদিতে আছে।]

যাজ্ঞবল্ক্য

বৈদিক যুগে যাজ্ঞবল্ক্য নামে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি ছিলেন মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য। বৈশম্পায়ন একবার ভুল করিয়া একটি গুরুতর অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য শিষ্যগণকে ব্রহ্মবধ্যা ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বলেন। গুরুর আদেশে শিষ্যগণ সকলেই ঐ ব্রত সাধনের জন্যে প্রস্তুত হইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য গুরুদেবকে বলিলেন,—"আপনার এই অপদার্থ শিষ্যগণ সারাজীবনের তপস্যা দিয়েও আপনাকে পাপমুক্ত করতে পারবে না। আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি একাই ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করে আপনার পাপমুক্তি ঘটাব।"

একথা শুনিয়া শিষ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইল। গুরুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দাম্ভিক মূর্খ! তোর এত দূর স্পর্দ্ধা! তুই আমার সম্মুখে আমার শিষ্যগণকে অপমানিত করলি! তুই এখনি আশ্রম ত্যাগ করে চলে যা। আমার কাছে যা যা অধ্যয়ন করেছিস, সব ফিরিয়ে দিয়ে যা।"

এই কথায় যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—"আপনার শিক্ষা দেওয়া বিদ্যা—যজুঃ সকল আমি বমন করে দিচ্ছি। এ বিদ্যার প্রয়োগ আমি জীবনে করব না। আজ হতে সমস্ত ভুলে গিয়ে আমি মূর্খ হলাম। মানুষের কাছে আমি আর বিদ্যা গ্রহণ করব না। নিজের সাধনায় আমি চতুর্ব্বেদের জ্ঞান লাভ করব। তা যদি না পারি তা হলে অগ্নিতে প্রবেশ করব।"

এই বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর আশ্রম ত্যাগ করিয়া সূর্য্যের উপাসনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বৎস, বর প্রার্থনা কর।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—"দেব, আপনি গুরু হয়ে—আমাকে বেদ পড়ান।" সূর্য্য বলিলেন—"আমি এই জলের কলসে বেদমন্ত্র নিক্ষেপ করছি, তুমি এই জলে স্নান করে বেদ অধ্যয়ন করলে তা' তোমার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হবে।"

এইভাবে বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য গৃহে ফিরিলেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি বিবাহ করিলেন। তাঁহার দুই পত্নী, একজনের নাম মৈত্রেয়ী, আর একজনের নাম কাত্যায়নী।

এই যুগে ভারতবর্ষে কুরু, পঞ্চাল ও বিদেহ নামে তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল। এই বিদেহ দেশের রাজা ছিলেন জনক। তিনি নিজে বেদবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের প্রতিপালক ছিলেন। তিনি রাজা হইয়াও ঋষি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে তিন রাজ্যের যত বেদজ্ঞ ঋষি ছিলেন—সকলকে রাজসভায় আহ্বান করিয়া সম্মানিত করিতেন। ঋষিগণ একত্র মিলিয়া বেদ সম্পর্কে তর্কবিতর্ক ও আলোচনা করিতেন। একবার তিনি খুব বড় একটা যজ্ঞ করিয়া দেশের সমস্ত ঋষিদের

নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন। যজ্ঞ শেষে দক্ষিণা দেওয়ার সময় হইলে রাজর্ষি জনক ভাবিলেন—এইবার জানিয়া লওয়া যাক্—ইঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে জ্ঞানী কে?

তিনি ঋষিদের আহ্বান করিয়া বলিলেন—"আপনারা সকলেই মহাজ্ঞানী। যিনি সবচেয়ে জ্ঞানী, তিনি একহাজার গাভী পাইবেন। ঐ গাভীদের শিঙে ১০টি করিয়া স্বর্ণমুদ্রা বাঁধা আছে।"

এই কথা শুনিয়া ঋষিগণ সকলেই চুপ করিয়া থাকিলেন। কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না—আমি সব চেয়ে জ্ঞানী। কিছুক্ষণ পরে যাজ্ঞবল্ক্য উঠিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্যকে ডাকিয়া বলিলেন—"সামশ্রব, এই হাজার গাভী তুমি আশ্রমে নিয়ে যাও।"

এতক্ষণে ঋষিদের চৈতন্য হইল। তাঁহারা তখন একে একে যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন। মহর্ষি শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিলেন না। রাজপুরোহিত অশ্বল ভাবিয়াছিলেন—কেহই সাহস করিবে না, গাভীগুলি তাঁহারই হইবে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—"যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি সব চেয়ে জ্ঞানী? এত সাহস তোমার! কেমন জ্ঞানী তুমি দেখি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।" এই বলিয়া অশ্বল প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য প্রত্যেকটির উত্তর দিলেন। অশ্বল হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঋষিরা লজ্জিত ও দুঃখিত হইল—জনক খুব আহ্লাদিত হইলেন।

শেষকালে উঠিলেন একটি নারী। ইনি বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী। বৈদিক যুগে নারীরাও বেদবিদ্যায় অনেক সময় ঋষিদের সমকক্ষ হইতেন। গার্গী উঠিয়া এইবার জটিল প্রশ্ন করিতে

লাগিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য শান্তভাবে প্রত্যেকটির উত্তর দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য যত সহজে ঋষিদের ক্ষান্ত করিয়াছিলেন—গার্গীকে তত সহজে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। গার্গীর বিদ্যা ও তেজ দেখিয়া ঋষিরা অবাক হইয়া গেলেন। গার্গী যখন বসিয়া পড়িলেন, তখন আর কেহ উঠিতে সাহস করিলেন না।

যাজ্ঞবল্ক্য বিচারে জয়লাভ করিয়া হাজার গাভী লইয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। জনক-সভার ঋষিদের প্রশ্ন ও যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর যে গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদ।

যাজ্ঞবল্ক্য ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন সন্ন্যাস-গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। দুই পত্নীকে (মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী) ডাকিয়া বলিলেন—"আমি এইবার সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে গভীর বনে প্রবেশ করব। আমার যে ধনসম্পত্তি আছে, তা তোমাদের দু'জনের মধ্যে ভাগ ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। তোমরা একত্রেই থেকো। যদি বনিবনা না হয়, সেই ভয়ে সম্পত্তি দুই ভাগ ক'রে দিতে চাই।"

মৈত্রেয়ী প্রায় গার্গীর মতই বিদ্যাবতী ছিলেন। স্বামী চলিয়া যাইবেন সন্ন্যাসী হইয়া, আর তিনি তাঁহার ধনসম্পত্তি ভোগ করিবেন—এই কথা ভাবিয়া তাঁহার দুঃখ ও অভিমান হইল। তিনি বলিলেন—"প্রভু, আমি এই ধন-সম্পত্তি ভোগ ক'রে কি অমরতা বা মুক্তিলাভ করব? যাতে আমি অমৃত লাভ করতে পারি, আপনি আমাকে সেই উপদেশ দিন।" যাজ্ঞবল্ক্য তখন মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। সেই উপদেশ লাভ করিয়া মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত সন্ন্যাসিনী হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন।

[যাজ্ঞবল্ক্যের কাহিনী ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে।]

পূর্ব্বকালে ঋতধ্বজ নামে এক পরাক্রান্ত ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। ইনি মহারাজ রিপুজিতের পুত্র। রিপুজিৎ বৃদ্ধ বয়সে যোগ্য পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিয়ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার উপদেশে ঋতধ্বজ রাজকার্য্য করিতেন। ইনি ব্রাহ্মণ, ঋষি, যোগী, জ্ঞানী, গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের প্রতিপালন করিতেন, অনাথ-আতুরদের জন্য অনাথাশ্রম ও দানসত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রজাগণকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। ঋষিদের আশ্রমে দৈত্য বা রাক্ষসদের উপদ্রব হইলে ঋতধ্বজ উপদ্রবকারীদের বিতাড়িত করিয়া ঋষিদের যাগযজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-সম্পাদনে সহায়তা করিতেন।

পাতালকেতু নামে এক দৈত্য গালব ঋষির আশ্রমে কিছুদিন হইতে উপদ্রব করিতেছিল। মহর্ষি গালব ঋতধ্বজকে একটি অশ্ব উপহার দিয়া নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, পাতালকেতুর উপদ্রবে আমার আশ্রমে যাগযজ্ঞ বন্ধ হ'য়ে গেছে—আপনি এই

অশ্বে আরোহণ ক'রে দৈত্যকে যুদ্ধে পরাজিত করুন। এই অশ্ব গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু আমাকে দিয়েছেন। এই অশ্বে আরোহণ করলে আপনার তেজ ও প্রতাপ বহুগুণে বেড়ে যাবে। আর একটি নিবেদন, ঐ পাতালকেতু বিশ্বাবসুর বালিকা কন্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে—সেই কন্যাটিকেও আপনার উদ্ধার করতে হবে।"

রাজা ঋষির প্রদত্ত অশ্ব গ্রহণ করিলেন এবং অবিলম্বে ঐ অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পাতালকেতু যুদ্ধে নিহত হইল। ঋতধ্বজ বিশ্বাবসুর কন্যা মদালসাকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। বিশ্বাবসুর অনুরোধে রাজা মদালসাকে বিবাহ করিলেন।

পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সুযোগ সন্ধান করিতে লাগিল। সে যমুনাতীরে আশ্রম রচনা করিয়া একজন ঋষির ছদ্মবেশে বাস করিতে লাগিল। ঋতধ্বজ একবার প্রজার অবস্থা নিজের চোখে দেখিবার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তালকেতুর আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইলে, তালকেতু রাজাকে নিজের আশ্রমে লইয়া আসিলেন। রাজা মুনিঋষিদের পরম ভক্ত ছিলেন। ছদ্মবেশী তালকেতুর অনুরোধে তিনি আশ্রমে একদিন বাস করিতে সম্মত হইলেন। ধূর্ত্ত তালকেতু রাজাকে বলিল—"মহারাজ, আমি বরুণালয়ে যে যজ্ঞ করছি, দক্ষিণা দিতে না পারায় তা পূর্ণ হয়নি। আপনি যদি দয়া ক'রে আপনার গলার হারটি দেন, তা হ'লে আমি এই হার দক্ষিণা দিয়ে যজ্ঞফল লাভ করতে পারি।"

মহারাজ তৎক্ষণাৎ সেই হার তালকেতুর হাতে দিয়া বলিলেন—"তপোধন, আপনার আর কিছু প্রার্থনা আছে?" তালকেতু বলিল—"আমি যতদিন না ফিরে আসি, তত দিন আপনি এই আশ্রমেই থাকুন।"

মহারাজ তাহাতেও সম্মত হইলেন। তালকেতু ঋতধ্বজের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মহারাজ রিপুজিৎকে সেই হার দেখাইয়া বলিল—"আপনার পুত্র দৈত্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে নিহত হয়েছেন—তাঁর এই হারটি দৈত্যরাজ আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

এই কথা শুনিয়া রিপুজিৎ পুত্রশোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। মহিষী মদালসা যখন ইহা শুনিলেন, তখন তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন —তাঁহার জ্ঞান আর ফিরিল না। নাগরাজ অশ্বতর ছিলেন ঋতধ্বজের সখার পিতা। তিনি মদালসার মৃতদেহ নিজগৃহে লইয়া গেলেন—পুনর্জীবন দান করিবার আশ্বাস দিয়া। অশ্বতর ছিলেন মহাদেবের পরমভক্ত। অশ্বতর মহাদেবের উপাসনা করিয়া মদালসার জ্ঞান সঞ্চার করিলেন।

ঋতধ্বজ ফিরিয়া আসিয়া বুঝিলেন—সবই দৈত্যদের শঠতার খেলা। মদালসার মৃত্যুসংবাদে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িলেন। অশ্বতর তখন রাজাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া পুনর্জীবিতা মদালসাকে অর্পণ করিলেন। মদালসাকে ফিরিয়া পাইয়া ঋতধ্বজও যেন পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

মদালসা ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী। তাঁহার চারিপুত্র ছিল—বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রুমর্দ্দন ও অলর্ক। পুত্রগণ জননীর কাছে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লাভ করিয়া সংসারবিরাগী হইয়া পড়িল। ঋতধ্বজ বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। একে একে তিনপুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ পুত্র অলর্কও যদি সংসার ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজ্যরক্ষা হয় না। ঋতধ্বজ মদালসার কাছ হইতে কনিষ্ঠ পুত্রকে চাহিয়া লইয়া রাজধর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এক দিকে জননীর ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, অন্য

দিকে পিতার রাজধর্ম্মের উপদেশ, অলর্ক একাধারে রাজা ও ঋষি হইয়া উঠিলেন। ঋতধ্বজ ও মদালসা রাজর্ষি অলর্কের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া আশ্রমজীবন যাপন করিতে চলিয়া গেলেন।

কবি তাই মদালসার উদ্দেশে বলিয়াছেন :

আদর্শ জননী তুমি মূর্ত্তিমতী গোপন সাধনা,
ভারতের মাতৃত্বের শরীরিণী আকুন্তি বেদনা।
চেয়েছে চরম ইষ্ট স্নেহ তব, বুকের সন্তানে
অল্পে না ভুলায়ে রেখে, পাঠায়েছ ভূমার সন্ধানে,
সন্ন্যাসের দীক্ষা দিয়া, শিক্ষা দিয়া অমৃত আগ্রহে
ব্রহ্মে চিরমিলনের লোভে রহি ঐহিক বিরহে।
একে একে বৎসগণে সাজাইয়া বৈরাগীর বেশে
জানি না মাতৃত্ব তব রাজপুরে ছিল কত ক্লেশে।
শুধু জানি মর্ত্ত্যলোকে ব্রহ্মময়ী তুমি কল্পলতা,
মোক্ষদার রূপে তুমি জিনিয়াছ স্তন্যদার ব্যথা।

—(পর্ণপুট)

[এই কাহিনী বামনপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে।]

গুরু গৌতমের আশ্রমে একটি সুদর্শন বালক আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৎস, তুমি কি চাও ?" ছেলেটির সরল সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া ঋষির ইচ্ছা হইল তাহাকে বুকে টানিয়া ল'ন। বালক বলিল—"আমি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে চাই।"

গৌতম বলিলেন—"বৎস, তোমার নাম কি ? তোমার গোত্র কি ?"

সত্যকাম বলিলেন—"আমার নাম সত্যকাম, কিন্তু গোত্র কি তা জানি না। আমার পিতা নেই। ভগবানই আমার পিতা।"

একথা শুনিয়া আশ্রমের বালকগণ হাসাহাসি করিতে লাগিল। গুরু তাহাদের শান্ত হইতে বলিয়া সত্যকামকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"তাত, তুমি ত' অব্রাহ্মণ নও, তোমার গোত্র ত' তোমার নামের প্রথম অংশ, দ্বিতীয় অংশ নয়। তুমি সত্যকুলজাত। সত্যই ব্রাহ্মণত্ব, রক্ত নয়। তুমি আজ থেকে আমার শিষ্য হ'লে।"

গুরু গৌতম সত্যকামের উপনয়ন দিলেন। তারপর গৌতম সত্যকামকে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সত্যকামের

ধী-শক্তি ও স্মৃতিশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, অতি অল্পকালের মধ্যে বহু শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞান জন্মিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, সত্যকামের কথাবার্ত্তা, গতিবিধি, রুচিপ্রকৃতি সমস্তই সদ্ব্রাহ্মণের পুত্রের মত। গৌতম বুঝিলেন, তিনি ভুল করেন নাই।

এইবার গুরু গৌতম সত্যকামের কঠোর তপস্যার ব্যবস্থা করিলেন—তপস্যার দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইলে তিনি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। গুরু তাঁহাকে জীর্ণ-শীর্ণকায় একদল গোরু দিয়া বলিলেন—"এইগুলি নিয়ে দূরবনে চ'লে যাও। সেখানে এদের পরিচর্য্যা করগে। এইগুলির সম্বন্ধে কি করতে হবে, তা তুমি নিজে ভেবেই স্থির কোরো।"

সত্যকাম গোরুগুলিকে লইয়া দূরবনে চলিয়া গেলেন। তিনি বুঝিলেন—এইগুলিকে সুপুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

বৎসরের পর বৎসর সত্যকাম বনের মধ্যে গোরুগুলির সেবা করেন—যেখানে কচি ঘাস পাওয়া যায়, সেখানেই তাহাদের লইয়া গিয়া চরান—কখনও মাঠে, কখনও পাহাড়ের গায়, কখনও নদীর ধারে গোরুগুলির চরানোর ব্যবস্থা করেন—বন্য জন্তুর কবল হইতে তাহাদের রক্ষা করেন; গোদুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল—গোরুর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে—গোরুগুলি সুপুষ্ট হইয়াছে—কিন্তু সত্যকামের সে খেয়াল নাই। একদিন বায়ুদেবতা একটি ষাঁড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া "সত্যকাম, সত্যকাম," বলিয়া ডাক দিতে লাগিলেন। সত্যকাম চমকাইয়া উঠিলেন,—বুঝিলেন—তাঁহার গোরুর পালের প্রধান ষাঁড়টি মানুষের ভাষায় কথা বলিতেছে। সত্যকাম বুঝিলেন—কোন দেবতা ষাঁড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথা বলিতেছেন। সত্যকাম বলিলেন—"ভগবন্, কি আদেশ করছেন?"

ষণ্ড বলিল—"সত্যকাম, তোমার ব্রহ্মবিদ্যালাভের কি হ'ল? তুমি গোরুগুলি গুণে দেখ, তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে—তাদের সবারই দেহ বেশ নধর চিকন। আর কেন? গুরুগৃহে ফিরে যাও। আমি বায়ু দেবতা তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যার একপাদ শুনাচ্ছি, শোন।"

সত্যকাম বলিলেন—"বলুন প্রভু, আমি অবহিত আছি।"

বায়ু ব্রহ্মবিদ্যার একপাদ বলিয়া কহিলেন—"যাও, অগ্নিদেবতা তোমাকে দ্বিতীয়পাদ শোনাবেন।"

সত্যকাম গোরুর পাল লইয়া গুরুর আশ্রমের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে সন্ধ্যা হইলে সত্যকাম সন্ধ্যাহোমের অগ্নি জ্বালাইয়া বায়ুর কাছ হইতে শেখা ব্রহ্মবিদ্যার একপাদের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

সহসা অগ্নির মধ্য হইতে তাঁহার নাম শুনিলেন।

অগ্নি বলিলেন—"বৎস, ব্রহ্মবিদ্যার দ্বিতীয়পাদ তোমাকে শুনাই, মন দিয়ে শোনো।" সত্যকাম অবহিত হইয়া শুনিলেন।

তখন অগ্নি বলিলেন—"তৃতীয়পাদ তোমাকে হংস শুনাইবেন।"

পরদিন প্রাতে আবার সত্যকাম যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে আবার সন্ধ্যাহোমের অগ্নি জ্বালিলে একটি হংস আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয়পাদ শিখাইয়া গেলেন। হংস বলিলেন—"আমি সূর্য্য, তোমার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে আমি হংসরূপে তোমাকে দেখা দিলাম। চতুর্থ পাদ শিক্ষা দেবেন মদ্‌গু পক্ষিরূপে স্বয়ং প্রাণ-শক্তি।"

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় সন্ধ্যাহোমের সময় যখন সত্যকাম তিনপাদ ব্রহ্মবিদ্যা লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন এক মদ্‌গু পক্ষী আসিয়া তাঁহাকে চতুর্থ পাদ শিক্ষা দিলেন।

এই চারিপাদ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া সত্যকামের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

পঞ্চম দিনে সত্যকাম গুরুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। গুরু দেখিলেন, সত্যকাম কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গোরুগুলির পানে চাহিয়া তিনি তাহার কঠোর তপস্যার পরিচয় পাইলেন, আর দেখিলেন সত্যকামের মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ্তি।

গৌতম বলিলেন—"একি বৎস, তোমার মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের দীপ্তি কোথা থেকে এলো? কে তোমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিল?"

সত্যকাম সকল কথা অকপটে বলিলেন।

গুরু বলিলেন—"তবে আমার কাছে তোমার ব্রহ্মবিদ্যা-শিক্ষার ত' প্রয়োজন নেই?"

সত্যকাম বলিলেন—"প্রভু, আমি দেবতাদের কাছ হ'তে সূত্রমাত্র পেয়েছি, আমার জ্ঞানের স্ফুরণ হয়নি। আমি যা পেয়েছি, তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন। আপনার উপদেশ ছাড়া তা ত' সম্ভব নয়।"

গৌতম বলিলেন—"হাঁ বৎস, ঠিকই বলেছ। তপস্যার দ্বারা দেবতাদের কৃপায় সূত্রমাত্রই পাওয়া যায়। গুরুর প্রয়োজন ব্যাখ্যার জন্য।"

সত্যকাম গুরুর আশ্রমে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া দাসী মায়ের কুটীরে ফিরিয়া গেলেন।

মা পুত্রকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। জননী জবালার আদেশে সত্যকাম বিবাহ করিলেন, তারপর তিনি শিষ্যদের শিক্ষাদানের জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন। শত শত শিষ্য সত্যকামের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে একজন দাসীপুত্রের আশ্রম ভারতের একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইয়া উঠিয়াছিল।

বৃত্রাসুর ও দধীচি

দৈত্যেরা দেবতাদের শত্রু ছিল বলিয়া দৈত্যদের আমরা ভক্তি করি না। কিন্তু দৈত্যেরা দেবতাদের ভ্রাতা। কশ্যপ ঋষির এক পত্নী অদিতি। অদিতি দেবতাদের মাতা। আর এক পত্নী দিতি; দিতি ছিলেন দৈত্যদের মাতা। দেবতারা স্বর্গরাজ্য পাইয়াছিলেন, দৈত্যরা দুরাচারী ছিল বলিয়া রাজ্যের ভাগ পায় নাই। বড় বড় দৈত্য তপস্যা করিয়া ব্রহ্মা বা শিবের নিকট হইতে বর আদায় করিত এবং তপস্যা ও বরের বলে তাহারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া দেবতাদের তাড়াইয়া দিত। তখন ব্রহ্মা বা শিবের সাহায্য লইয়াই দৈত্যদের বধ করিয়া দেবতাদের আবার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে হইত। এইরূপ একজন দৈত্য বৃত্র।

মহাতেজা দেবর্ষি ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট সাধনের জন্য পুত্র কামনা করেন। তাঁহার ত্রিশিরা নামে এক পুত্র হয়। এই ত্রিশিরার তিনটি মুখ ছিল। এক মুখে সে

বেদপাঠ করিত, আর একমুখে সুরা পান করিত, আর একমুখ সমস্ত সৃষ্টি গ্রাস করিবার জন্য যেন উদ্যত হইয়া থাকিত।

ইন্দ্রকে তাড়াইয়া তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইতে হইলে তপস্যা করিতে হয়। ত্রিশিরা তপস্যা করিতে গেলেন বনের ভিতর। ইন্দ্র ভয় পাইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত্রিশিরাকে টলাইতে পারিলেন না। শেষে নিজে তাঁহাকে বধ করিতে গেলেন। কিন্তু দৈত্য হইলেও ত্রিশিরা ঋষির পুত্র, ব্রাহ্মণ। তাঁহাকে বধ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হইতে হইবে।

এই সময়ে একজন কাঠুরিয়া সে-দিক দিয়া যাইতেছিল। ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন—"তুমি এই তপস্বীকে কুড়াল দিয়া হত্যা কর।"

কাঠুরিয়া বলিল—"সেকি! আমি অকারণে এই তপস্বীকে বধ করব কেন? তপস্বী ত' কোন অপরাধ করেনি।"

ইন্দ্র বলিলেন—"আমি ইন্দ্র, আমি বলছি, তুমি বধ করো। একে বধ করলে তুমি যা চাও, তা-ই দেব।"

কাঠুরিয়া বলিল—"তা না হয় হ'ল! আমার যে মহাপাপ হবে—তার উপায়?"

ইন্দ্র বলিলেন—"প্রায়শ্চিত্ত করলেই চলবে। তোমাকে আমি বর দেব।"

অনেক কথা-কাটাকাটির পর শেষ পর্য্যন্ত কাঠুরিয়া রাজী হইল। কাঠুরিয়া তিনকোপে ত্রিশিরার তিনটি মাথা কাটিয়া ফেলিল।

এই সংবাদ যখন ত্বষ্টা শুনিলেন, তখন তিনি ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া একটি জটা ছিঁড়িয়া যজ্ঞের কুণ্ডে আহুতি দিলেন। অমনি এক বিরাটকায় দৈত্যের আবির্ভাব হইল। এই দৈত্যের নাম

বৃত্রাসুর। বৃত্র যজ্ঞের আগুন হইতে উঠিয়া বলিল—"তাত, আদেশ করুন—আমাকে কি কাজ করতে হবে?"

ত্বষ্টা বলিলেন—"যাও, তুমি ইন্দ্রকে বধ কর গিয়ে।"

বৃত্র অবশ্য তখনই ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য ছুটিল না। সে ঋষিপুত্র, কাজেই তাহার উপনয়ন হইল। তারপর সে গেল দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে বেদ-অধ্যয়নের জন্য। দীর্ঘকাল বেদ ও নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া সে জ্ঞানী হইল। তার পর সে যৌবন-কালে এই পৃথিবীর সম্রাট্ হইল। সম্রাট্ হইয়া বৃত্র আদর্শ রাজধর্ম্ম অনুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিল। প্রথমে সে পাতাল জয় করিল। তার পর সে গেল স্বর্গ জয় করিতে। ইন্দ্রের সঙ্গে বৃত্রের আটাশ বার যুদ্ধ হইল, ইন্দ্র একবারও জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বৃত্র স্বর্গের রাজা হইয়া বসিল। আর ইন্দ্র দেবতাদের ও পরিজনগণের সহিত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া কোথাও নিরাপদ আশ্রয় না পাইয়া ব্রহ্মলোকে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এ দিকে ইন্দ্র জীবিত থাকিতে বৃত্র নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। সে ইন্দ্রবধের শক্তিলাভের জন্য তপস্যা করিতে নৈমিষারণ্যে গেল। ইন্দ্র ভাবিলেন—এই সুযোগে স্বর্গ অধিকার করা যাইতে পারে। কিন্তু বারবার চেষ্টা করিয়াও ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিলেন না—বৃত্রের সেনাপতিরা প্রত্যেক বারই ইন্দ্রকে হটাইয়া দিল।

ইন্দ্র তখন সকল গতির শেষ গতি বিষ্ণুর চরণতলে গিয়া শরণ লইলেন। বিষ্ণু বলিলেন—"বৃত্র দুর্জ্জয় ছিল, এবার তপস্যা ক'রে অজেয় হ'ল। দেখ দেখি খুঁজে বৃত্রের চেয়ে আরো কঠোর তপ যে করেছে—এমন কাউকে পাও কিনা।"

ইন্দ্র সেইরূপ তপস্বী খুঁজিয়া বাহির করিলেন। ইনি চ্যবন

মুনির পুত্র ঋষি দধীচি। একবার ইঁহার ক্ষুপ রাজার সঙ্গে খুব বিবাদ হয়। ক্ষুপ বলেন—রাজা বড়, দধীচি বলেন—ঋষি বড়। দধীচি রাগিয়া ক্ষুপ রাজার মাথায় লাথি মারেন। ক্ষুপ ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া দধীচিকে বধ করেন। শুক্রাচার্য্য দধীচিকে সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা বাঁচাইয়া দিলেন এবং মহাদেবের আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তপে তুষ্ট করিবার জন্য উপদেশ দিলেন।

শুক্রাচার্য্যের উপদেশে দধীচি এমন কঠোর তপস্যা করেন যে, ইন্দ্র ভয় পাইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে টলাইতে পারেন না। শিবের বরে দধীচির অস্থি বজ্রে পরিণত হয়।

ইন্দ্র বিষ্ণুর কাছে গিয়া জানাইলেন—"দধীচি ঋষি বৃত্রের চেয়েও কঠোর তপ করেছেন—আমি তা ভালো ক'রেই জানি। এখন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি কি ক'রে বৃত্রবধের সাহায্য করতে পারেন, বলুন।"

বিষ্ণু বলিলেন—"তিনি যদি নিজের ইচ্ছায় দেহ ত্যাগ করেন, তবে তাঁর অস্থিতে বজ্র তৈরি ক'রে তাই দিয়ে তুমি বৃত্র বধ করতে পারবে। তবে ইতিমধ্যে বৃত্রের সঙ্গে সন্ধি কর—সুযোগমত তাকে বধ করতে চেষ্টা কর। সে শিবের কাছ হ'তে যে শূল পেয়েছে, সে শূলে সে বজ্রকেও নিবারণ করতে পারে।"

ইন্দ্র তখন দধীচির তপোবনের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—"আমার ইন্দ্রত্ব কেড়ে নেবে—এই ভয়ে যাঁর তপ ভঙ্গ করবার জন্য আমি একদিন চেষ্টা করেছিলাম, আজ দেখছি—তাঁর সেই তপই আমাকে বাঁচাবে, ইন্দ্রত্ব ফিরিয়ে দেবে।"

দধীচির তপোবনে গিয়া ইন্দ্র হাত জোড় করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

ঋষি বলিলেন—"ইন্দ্র, তোমার আজ এত স্তবের ঘটা কেন? উদ্দেশ্য কি? কি কথা বলতে চাও?"

ইন্দ্র বলিলেন—"প্রভু, বলতে বাক্য সরছে না। আমি সে কথা উচ্চারণ করতে পারছি না মুখ দিয়ে।"

ঋষি তখন ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন ইন্দ্র কি জন্য আসিয়াছেন।

মহর্ষি বলিলেন—"বুঝেছি বৎস, দেহ যখন ত্যাগ করতেই হবে, তখন লোকহিতের জন্য ত্যাগ করার চেয়ে পরম ধর্ম্ম আর কি আছে? আমার অস্থি দিলে যদি স্বর্গরাজ্য দৈত্যদের হাত হ'তে রক্ষা পায়, তবে এ অস্থিধারণ সার্থক। বৎস ইন্দ্র, তুমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত হ'য়ো না। আমি এখনি যোগাসনে দেহ ত্যাগ করছি।"

এই বলিয়া মহর্ষি যোগবলে দেহত্যাগ করিলেন। দেবতারা সেই দেহ বহন করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইল। কিন্তু বৃত্রের সঙ্গে সম্মুখ সমরে এই বজ্রও ব্যর্থ হইল।

ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে আবার সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

সন্ধি হওয়ার পর ইন্দ্রের স্বর্গপুরীতে যাতায়াত ছিল। একদিন বৃত্র সুরাপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই অবসরে ইন্দ্র বজ্রের আঘাতে বৃত্রকে হত্যা করিলেন।

[বৃত্রাসুরের কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হরিবংশ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে আছে। ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে কাহিনীর ইতরবিশেষ আছে।]

কশ্যপ ঋষির বহু পত্নীর মধ্যে একজনের নাম অদিতি, আর একজনের নাম দিতি। অদিতির পুত্রেরা দেবতা, আর দিতির পুত্রেরা দৈত্য।

দিতির পুত্রদের সঙ্গে অদিতির পুত্রদের চিরকাল স্বর্গরাজ্য লইয়া বিবাদ চলিত। দিতির পুত্রেরা অতি কঠোর তপস্যা করিয়া শক্তি লাভ করিত। সেই শক্তির বলে বারবার দেবতাদের স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিত।

দেবতাদের দুইটি সুবিধা ছিল। অমৃত পান করিয়া দেবতারা অমর হইয়াছিলেন, আর বিষ্ণু তাঁহাদের সহায় ছিলেন। যখনই দেবতারা বিপন্ন হইতেন, তখনই বিষ্ণু দেবতাদের রক্ষা করিতেন।

দিতি কশ্যপকে একবার বলিলেন—"ইন্দ্রকে জয় করতে পারে আমাকে এমন একটি পুত্র দাও।"

কশ্যপ বলিলেন—"তুমি সহস্র বৎসর অদিতির মত নিয়ম পালন ক'রে ব্রতরক্ষা কর—তোমার ইন্দ্রজয়ী পুত্র হবে।"

দশশত বৎসর ধরিয়া কঠোর নিয়মপালনের ফলে দিতির বজ্রালী নামে এক পুত্র হইল। বরাঙ্গী নামে এক দৈত্যকন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। যৌবনকালে দুইজনে গেলেন তপস্যা করিতে। স্বামী স্ত্রী দুইজনেই ঘোরতর তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিতে করিতে বজ্রালীর মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তাঁহার আর ইন্দ্রের প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকিল না। ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে বজ্রালী বর চাহিলেন—"প্রভু, আমার যেন ধর্ম্মে মতি থাকে। আমি আর কিছু চাই না।"

বরাঙ্গী কিন্তু ইন্দ্রবিদ্বেষ ত্যাগ করিতে পারেন নাই, বর দিতে আসিলে তিনি ইন্দ্রবিজয়ী পুত্রবর প্রার্থনা করিলেন।

বরাঙ্গীর যে পুত্র হইল, সে ইন্দ্রবিজয় করিয়া দৈত্যগণকে রক্ষা ও তারণ করিবে—এই ভরসায় তাহার নাম দেওয়া হইল তারক। তারক যৌবনে তপস্যা করিতে গেল এবং কঠোর তপে এমন শক্তি লাভ করিল যে, দেবতাদের সমবেত শক্তির চেয়ে তাহা ঢের বেশি।

বর ও শক্তি লাভ করিয়া তারক স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। দেবতারা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যের পথে পথে ছদ্মবেশে ঘুরিতে লাগিলেন। বিষ্ণুও তারকাসুরকে বধ করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মা বলিলেন—"আমি বর দিয়েছি, বিষ্ণু নিজে তারককে বধ করতে অসমর্থ হয়েছেন। এখন এক উপায় মহাদেব। মহাদেবের শক্তি হ'তে কোন শক্তিধর পুত্রের জন্ম না হ'লে তারকাসুর নিহত হবে না।"

দেবতারা বলিলেন—"মহাদেব তো সতীর দেহত্যাগের পর যোগে মগ্ন। তা ছাড়া, সতীই তো নেই। কি ক'রে তাঁর

যোগভঙ্গই বা করা যায়, আর কি ক'রেই বা শিবকে পুনরায় বিবাহে সম্মত করানো যায় ?"

ব্রহ্মা বলিলেন—"সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যৌবনপ্রাপ্তাও হয়েছেন। কিন্তু শিবের তপোভঙ্গ করাতে না পারলে তাঁর সঙ্গে তো মিলন হ'তে পারে না।"

দেবতারা বলিলেন—"তপোভঙ্গের উপায় কি, পিতামহ ? যে যাবে, সে-ই তো ভস্মীভূত হবে !"

ব্রহ্মা বলিলেন—"বিপদ খুবই আছে বটে। মহাদেব হিমালয়ে গঙ্গার উৎপত্তিস্থানের নিকটেই যোগে মগ্ন আছেন। সতী হিমালয়ের কন্যা হ'য়ে জ'ন্মে এখন উমা নামে খ্যাতা। উমা শিবকে স্বামিরূপে পাবার জন্য শিবের অনুমতি নিয়ে তাঁর সেবা করছেন। এখন শিবের দৃষ্টি তাঁর দিকে ফেরানোর দরকার। উমা দিনের পর দিন সেবা ক'রে চলেছেন, কিন্তু শিব তাঁর পানে চেয়েও দেখেন না। এখন তোমরা মদনের সাহায্য নাও। উমা যখন শিবের হস্তে অর্ঘ্যদান করবেন, তখন মদন যদি ফুলশরে মহাদেবকে আঘাত করেন, তা হ'লে শিব বিচলিত হ'য়ে উমার প্রতি প্রসন্ন হ'তে পারেন। তোমরা মদনের সাহায্য নাও।"

ইন্দ্র মদনকে আহ্বান করিয়া ব্রহ্মার উপদেশমত ফুলশরের দ্বারা মহাদেবের যোগভঙ্গ করিবার আদেশ দিলেন। কাজ অত্যন্ত দুরূহ, তাহার উপর ইহাতে তাহার প্রাণহানি হইবার কথা। সে কিন্তু বিপদের কথা ভাবিতেই পারিল না। সে বীরদর্পে মহাদেবের যোগভঙ্গের ভার লইয়া চলিয়া গেল।

মদনের পত্নী রতি যখন একথা শুনিল, তখন সে ভয় পাইয়া গেল। সে মদনকে এরূপ দুঃসাহসের কাজ হইতে বিরত হইতেই অনুনয় করিল, কিন্তু মদন শুনিল না। কাজেই রতি

মদনের সঙ্গে সঙ্গেই গেল। এদিকে মদন তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র বসন্ত মদনের সহায় হইল। তপোবনে বসন্তের আবির্ভাব হইল।

গাছে গাছে লতায় লতায় ফুল ফুটিয়া উঠিল, পাখীরা নানাস্বরে কূজন করিতে লাগিল, দক্ষিণ পবন বহিতে লাগিল।

মদন লতাপাতার অন্তরালে থাকিয়া সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যেমন উমা আসিয়া শিবকে অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন, অমনি মদন ফুলশর নিক্ষেপ করিল। হঠাৎ ফুলশরের আঘাতে মহাদেব বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কপালের লোচনে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহাতে মদন একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শিব তপের বিঘ্ন হওয়ায় স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রতি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। বসন্তকে ডাকিয়া রতি বলিল —"তুমি চিতা সাজাও, আমি সহমরণে যাব।"

রতি যখন দেহত্যাগের জন্য উদ্যত, তখন দৈববাণী হইল— "রতি, তুমি প্রাণত্যাগ ক'রো না। তোমার পতির সঙ্গে সত্বরই তোমার মিলন হবে। উমা তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করলে মহাদেব উমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করবেন, তখন মদন আবার বেঁচে উঠবেন।"

দৈববাণী শুনিয়া রতি প্রাণত্যাগে বিরত হইল।

উমা নিজের রূপগুণের দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে না পারিয়া, মাতার নিষেধ না শুনিয়া তপস্যা করিতে গেলেন। সে তপস্যা কি কঠোর! গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে উমা চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া তাহার মধ্যে বসিয়া সূর্য্যপানে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। শীতকালে হিমালয়ের তুষারশীতল জলের মধ্যে

বসিয়া তপস্যা করিতেন। ফলমূল ত্যাগ করিয়া উমা গাছের যে পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িত, শুধু সেগুলিই আহার করিতেন। শেষে তাহাও ত্যাগ করিলেন। সেজন্য তাঁহার নাম হইল অপর্ণা।

এইরূপ কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশে উমাকে পরীক্ষা করিতে আসিলেন। ছদ্মবেশী শঙ্কর উমার কাছে নিজের অজস্র নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন —"শ্মশানচারী বলদবাহন মহাদেবকে বিবাহ করিলে তোমার দুর্দ্দশার অবধি থাকিবে না।"

এই কথা শুনিয়া উমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। উমা রাগিয়া যখন স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন শিব নিজ মূর্ত্তি ধরিলেন। উমা লজ্জায় অবনতমুখী হইলেন। ইহার পর শিবের সহিত উমার বিবাহ হইল।

এই বিবাহের কিছুকাল পরে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইল।

পার্ব্বতী কার্ত্তিককে প্রতিপালন করেন নাই। ছয় কৃত্তিকা-ভগিনী কার্ত্তিককে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেজন্য পার্ব্বতী-নন্দনের নাম হইয়াছিল—কার্ত্তিক বা কার্ত্তিকেয়। ছয় ধাত্রীর স্তন্য একসঙ্গে পান করার জন্য কার্ত্তিকের ছয়টি মুখ উদ্গত হইল, এজন্য কার্ত্তিকের নাম হইল ষড়ানন।

দেবতারা কার্ত্তিকের জন্মের সন্ধান পাইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার আগেই তাঁহাকে সেনাপতির পদে বরণ করিলেন। কার্ত্তিকের সেনাপতিত্বে দেবগণ তারকাসুরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। কার্ত্তিকের শরে তারকাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

[ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, কুমারসম্ভব ইত্যাদি]

হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু দুই ভাই। কশ্যপ ঋষির পুত্র হইলেও দিতির গর্ভজাত বলিয়া তাহারা দৈত্য। এই দৈত্য কঠোর তপ করিয়া এত প্রতাপশালী হইল যে, দেবতারা ইহাদের ভয়ে কম্পমান থাকিত। এই দুই ভাইকে বধ করার জন্য বিষ্ণুকে দুইবার দুই অবতাররূপে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল।

এই পৃথিবীতে যখন বৃক্ষলতা বা জীবজন্তুর জন্ম হয় নাই, তখন এই পৃথিবী ছিল সাগরের তলে—পাতালে। ব্রহ্মা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বৃক্ষলতা দিয়া সাজাইবেন এবং মানুষের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীকে নূতন স্বর্গে পরিণত করিবেন, তাঁহার এই সঙ্কল্প ছিল। তিনি চাহিয়াছিলেন—দেবতারা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর উপভোগ্যও ভোগ করুক! কিন্তু দৈত্য হিরণ্যাক্ষ বাদ সাধিল। হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে হরণ করিয়া লইয়া পাতালে চলিয়া গেল। পৃথিবী সাগরের তলে বন্দী হইয়া থাকিল।

ব্রহ্মা তখন অন্য উপায় না দেখিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। তিনি ধ্যানে বসিলেন। বহুকাল অতীত হইয়া গেল, কিছুই ফল হইল না। সহসা একদিন তাঁহার নাসারন্ধ্র হইতে একটি ক্ষুদ্রাকার বরাহ বাহির হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে এই বরাহ বিরাটমূর্ত্তি ধরিল। ব্রহ্মা তখন বুঝিলেন, নারায়ণই বরাহ-মূর্ত্তি ধরিয়াছেন।

বরাহরূপী নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করব, বল।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"প্রভু, পৃথিবীকে আপনি সাগরতল থেকে উদ্ধার করুন।"

বরাহ তখন সাগবে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার বিশাল তুইটি দন্তের দ্বারা সাগরতল বিদীর্ণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। হিরণ্যাক্ষ বাধা দিতে আসিল। বরাহদেব তাঁহার দন্তের দ্বারা হিরণ্যাক্ষের বক্ষ বিদাবণ করিলেন। তারপর পৃথিবীকে দন্তেব উপর চড়াইয়া অন্ধকার পাতালপুরী হইতে সূর্য্যের আলোকে লইয়া আসিলেন।

হিরণ্যাক্ষ নিহত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রতিহিংসা লইবার সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিল। হিবণকশিপু মন্দর পর্ব্বতে গিয়া বহু বর্ষ ধরিয়া তপস্যা করিল। ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন—"দৈত্যরাজ, তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর প্রার্থনা কর।"

দৈত্যরাজ বলিল—"আমাকে অমরতার বর দিন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"অন্য বর চাও বৎস! আমি অমরতা বর দিতে পারি না। যার জন্ম আছে, তার মৃত্যু হবেই। তোমার যখন জন্ম হয়েছে, তখন তোমার মৃত্যু রোধ করতে আমি পারি না।"

দৈত্যরাজ তখন বলিল—"তবে আমাকে এমন বর দিন যে, আমি দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, মানুষ, জীবজন্তু কারো দ্বারা নিহত হব না। কোন অস্ত্রে আমি নিহত হব না। দিনে বা রাত্রিতে, জলে কিংবা স্থলে কেহ আমাকে নিহত করতে পারবে না।"

ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া চলিয়া গেলেন। বিষ্ণুদ্বেষী হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর পাইয়া নিজরাজ্যে ফিরিয়া পৃথিবীতে বিষ্ণুপূজা বন্ধ করিয়া দিল। যে ভুলিয়াও কখনও হরির নাম করিত, তাহার প্রাণদণ্ড হইত। তারপর সে স্বর্গে গিয়া দেবতাদের পরাজিত করিয়া বন্দী করিল। কেহ হরির নাম করিতে পারিবে না—সেই শর্ত্তে সে দেবতাদের ছাড়িয়া দিল। সে তখন হরির খোঁজে ত্রিভুবন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ত্রিভুবনে দৈত্যের ভয়ে কেহ হরির নাম করে না।

দেবতারা শ্রীহরির কাছে গিয়া নিবেদন করিল—"প্রভু, আপনার নাম উচ্চারণ পর্য্যন্ত দৈত্যরাজ ত্রিভুবনে বন্ধ ক'রে দিয়েছে। আপনি তার শাসন করছেন না? কত কাল সহ্য করবেন? আমরাই বা কতকাল তার অধীনে প্রজা হ'য়ে থাকব?"

শ্রীহরি বলিলেন—"ত্রিভুবন হ'তে আমার নাম ত' লুপ্ত হয়নি। একা সে-ই সারাদিনরাতই ত' বলছে—'কোথায় হরি, কোথায় হরি?' সবার ডাক সে একাই ডাকছে। তা ছাড়া দেখ, যারা আমার ভক্ত, তারা এত দিন মুখে আমার নাম করত, এখন তারা মনে মনে আমাকে ডাকছে। নাম-গান বন্ধ হয়েছে কিন্তু স্মরণ ত' সমানই চলছে বরং তা বেড়েছে। যাই হোক, তার কনিষ্ঠ পুত্রের দ্বারা তার উদ্ধারসাধন করতে হবে।"

হিরণ্যকশিপুর কনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ হরিভক্ত হইয়াই জন্মিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইলে প্রহ্লাদকে গুরুগৃহে পাঠানো হইল। প্রহ্লাদ দিনরাত কেবল হরিকেই স্মরণ করে—মুখে নামগান করে।

শুক্রাচার্য্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক প্রহ্লাদের শিক্ষাগুরু। ষণ্ড ও অমর্ক দুইভাই প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, যাহাতে প্রহ্লাদ ভুলিয়াও কখনও হরির নাম না করে।

কিছুদিন শিক্ষালাভের পর প্রহ্লাদ গৃহে ফিরিলে হিরণ্য প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিল—"বৎস, তুমি কোন্ বস্তু সর্ব্বোত্তম ব'লে মনে কর?"

প্রহ্লাদ উত্তর করিল—"গৃহ ত্যাগ ক'রে বনে গমন ক'রে হরির আরাধনা করাই সর্ব্বোত্তম মনে করি।"

হিরণ্য নিজে শিশুপুত্রের মুখে হরির গুণকীর্ত্তন শুনিয়া ষণ্ড ও অমর্ককে ডাকিয়া তিরস্কার করিল এবং বলিল—"তোমাদের প্রাণের ভয় নেই? তোমরা প্রহ্লাদকে কুশিক্ষা দিচ্ছ? প্রহ্লাদ হরির আরাধনাকে সর্ব্বোত্তম মনে করে—এ কুশিক্ষা সে কোথায় পেল? ভবিষ্যতে আর যেন এমন কথা না শুনি।"

ষণ্ড ও অমর্ক বলিল—"ধর্ম্মাবতার, আমরা বিষ্ণুবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই শিখাই না। আপনি আপনার অন্য তিন পুত্রকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"

প্রহ্লাদের ভ্রাতারা গুরুদ্বয়ের কথা সমর্থন করিল।

বৎসরখানেক পরে হিরণ্য আবার প্রহ্লাদের পরীক্ষা করিল। হিরণ্য বলিল—"বৎস প্রহ্লাদ, সুশিক্ষার বিষয় কি, বল দেখি।"

প্রহ্লাদ উত্তর করিল—"তাত, শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নয়টি

ভক্তির লক্ষণ। ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশে এইগুলি সমর্পণ করাই সর্ব্বোত্তম শিক্ষা মনে করি।”

হিরণ্য পুত্রের মুখে একথা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইল। সে ভাবিল—বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত। এই ভাবিয়া সে প্রহরীদের আদেশ দিল—“প্রহ্লাদকে হত্যা কর।”

প্রহরীরা সকল অস্ত্রে প্রহ্লাদকে আঘাত করিয়া দেখিল—অস্ত্র ভাঙিয়া যায়। প্রহ্লাদের অঙ্গে একটি দাগও লাগে না!

তখন হিরণ্য প্রহ্লাদের বধের জন্য একটির পর একটি ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

প্রহ্লাদকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিল। হাতী কিছুতেই প্রহ্লাদের দেহ বিদলিত করিল না, শুণ্ডের দ্বারা মদমত্ত করী তাহাকে পিঠে তুলিয়া লইল।

বিষধর সর্প তাহার দেহে নিবদ্ধ করা হইল। প্রহ্লাদ সাপগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহারা ফণাও তুলিল না।

পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু কে যেন শূন্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া ধীরে ধীরে মাটিতে শোওয়াইয়া দিল।

দিনের পর দিন খাদ্যের সঙ্গে বিষ দেওয়া হইল, বিষ অমৃতে পরিণত হইল। বহু দিন প্রহ্লাদকে অনাহারে রাখা হইল। সে আনন্দে হরিনাম করিয়া নৃত্য করিত। অনাহারে তাহার কিছুই হইল না।

গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। প্রহ্লাদ জলে ভাসিতে ভাসিতে কূলে চলিয়া আসিল।

জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ করা হইল—আগুন নিভিয়া গেল।

শেষে হিরণ্য প্রহ্লাদের বধের জন্য অভিচার ক্রিয়া করিতে লাগিল। এজন্য বহু যজ্ঞ করা হইল, প্রহ্লাদের তেজোবল তাহাতে বাড়িতে লাগিল।

হিরণ্য কিছুতেই প্রহ্লাদকে বধ করিতে না পারিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করিবে স্থির করিল। একদিন গোধূলির সময় হিরণ্য প্রহ্লাদকে বলিল—"তুই যে বলিস, তোর হরি সর্ব্বত্রই আছে, সব সময়েই রক্ষা করছে—আচ্ছা এই যে স্ফটিকস্তম্ভটা রয়েছে, এর মধ্যে তোর হরি আছে কি ?"

প্রহ্লাদ বলিল—"আছেন বৈকি বাবা !"

এই কথা বলিতেই হিরণ্য পদাঘাতে স্তম্ভটা ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল—"কই, দেখা !"

অমনি ভিতর হইতে নৃসিংহদেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং হিরণ্যকশিপুকে নিজের উরুর উপর ফেলিয়া দুই হাতের নখর দিয়া পেট চিরিয়া তাহাকে বধ করিলেন।

হিরণ্য যেরূপ বর পাইয়াছিল, তাহাতে বিশ্বের কাহারও হাতে তাহার মৃত্যু হইতে পারিত না। তাই ভগবান বিষ্ণু পশু ও নরের একটি মিলিত মূর্ত্তি ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে বধ করিলেন।

[ভাগবত, কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থে এই কাহিনী আছে]

বলি ও বামন

প্রহ্লাদের পৌত্র বলি। প্রহ্লাদ ছিলেন পরম হরিভক্ত। বলি ছিলেন বিষ্ণুদ্বেষী। বিষ্ণুনিন্দা করার জন্য প্রহ্লাদ বলিকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—"বিষ্ণুনিন্দার জন্য রাজ্য হারাবে। তোমার দারুণ অধঃপতন হবে।" বলি ইহাতে ভয় পাইয়া বলিলেন—"কি উপায় হবে, পিতামহ ? এমন শাপ কেন দিলেন ?"

প্রহ্লাদ বলিলেন—"উপায় আবার কি ? শ্রীহরিতে ভক্তি জন্মালেই সব ফিরে পাবে।"

প্রহ্লাদ হরিভক্ত ছিলেন—তাই বলিয়া ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার কম ছিল না, দেবতাদের তিনি শত্রু বলিয়াই মনে করিতেন। একশত বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদ দেবতাদের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধ চালান। বৃদ্ধবয়সে প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়া রাজত্ব ত্যাগ করেন। তিনি পৌত্র বলিকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে তপস্যার জন্য চলিয়া যান। বলি রাজা

হইয়া দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। বলির অন্তরে বিষ্ণুভক্তি তখনও জাগে নাই। পিতামহের অভিশাপের ফল ফলিল। ইন্দ্র বিষ্ণুর সহায়তায় বলিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলেন।

ইন্দ্রের ভয়ে বলি নানাস্থানে লুকাইয়া বেড়াইতেন। একবার তিনি গর্দ্দভের রূপ ধরিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ছদ্মরূপ ধরিলেও তাহা দেবতাদের দৃষ্টি এড়ায় না। ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া বলিলেন—"হে দৈত্যরাজ, আজ না হয় তুমি রাজ্যহারা হয়েছ। তাই বলে এ কি দুর্গতি তোমার! ছি ছি! কাপুরুষের মত তুমি একটা গর্দ্দভের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে আছ! বড়ই লজ্জার কথা!"

দৈত্যরাজ উত্তর দিলেন—"এতে আর লজ্জা বা দুঃখ কি আছে? তোমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা বিষ্ণুও মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদির রূপ ধরেছিলেন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য। তুমি নিজেও ব্রহ্মহত্যা করে মানস-সরোবরে পদ্মপাতার তলায় আশ্রয় নিয়েছিলে। আজ আমার দুর্দ্দিন—তাই আমাকে ধিক্কার দিচ্ছ। ইন্দ্র, আমার এদিন থাকবে না। চাকা উল্টে যাচ্ছে। ইহলোকের ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পদ আজ আছে—কাল নেই। তা নিয়ে গর্ব্ব করছ, কর। দু'দিন পরে তোমার দশাও এমনি হবে।"

দৈত্যগুরু বলিকে নানাস্থানে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা একদিন আবিষ্কার করিলেন। তিনি বলিকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে অভিষিক্ত করিলেন। সেই যজ্ঞের অগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র ইন্দ্রের রথের মত একটি রথ, ইন্দ্রের অশ্বের মত অশ্ব, সিংহচিহ্নিত ধ্বজা, স্বর্ণময় ধনু, দিব্য কবচ ও দুইটি অক্ষয় বাণে পূর্ণ তূণ উত্থিত হইল। শুক্রাচার্য্য একটি বিজয়শঙ্খ দান করিলেন।

নবরূপে সজ্জিত হইয়া বলি দৈত্যসেনা লইয়া প্রথমে পৃথিবীর

রাজ্য অধিকার করিলেন, তারপর স্বর্গরাজ্য-জয়ের জন্য যাত্রা করিলেন। দেবগণ ভীত হইয়া বৃহস্পতির শরণ লইলেন।

বৃহস্পতি বলিলেন—"তোমরা যুদ্ধ করতে যেও না। তোমরা এখন দুর্ব্বল। শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যার দ্বারা দৈত্যদের বাঁচিয়ে দেবে। তা ছাড়া, দুর্ব্বাসার অভিশাপ তোমাদের উপর চলছে। তোমরা সব স্বর্গ হ'তে স'রে পড়। মর্ত্ত্যলোকে গিয়ে মানুষ ও জীবজন্তুর মধ্যে লুকিয়ে থাক।"

বলি বিনাযুদ্ধে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন।

শুক্রাচার্য্যের উপদেশে বলি একশত বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন।

বৃহস্পতি দেবতাদের উপদেশ দিলেন—"দেখ, সমুদ্রমন্থন ক'রে অমৃত উদ্ধার করতে না পারলে আর দৈত্যদের তাড়ানো যাবে না। অমৃত পেলে তোমরা অমর হ'য়ে যাবে। শুক্রাচার্য্যের সঞ্জীবনী বিদ্যা তখন বেশি অনিষ্ট করতে পারবে না। সমুদ্র-মন্থন খুব দুরূহ কাজ। তোমরা একা পারবে না—দৈত্য ও দেবতা দুই দলে মিলে মন্থন করতে হবে। বলির কাছে গিয়ে প্রস্তাব করো। ওদের সাহায্যে সমুদ্রমন্থন ক'রে অমৃত উঠলে ওদের ফাঁকি দিয়ে তোমরা অমৃতভাণ্ডটা অধিকার ক'রে নিতে পারবে। বিষ্ণুর সঙ্গে পরামর্শ কর।"

দেবগণ বলির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সমুদ্রমন্থনের প্রস্তাব করিলেন। বলি সম্মত হইলেন। দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে যোগ দিয়া সমুদ্রমন্থন করিল—অমৃতও উঠিল। দেবতারা দৈত্যদের প্রবঞ্চনা করিয়া অমৃত অধিকার করিলেন। তাহাতে দেবাসুরে সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিল। দেবতারা কিছুতেই স্বর্গরাজ্য হইতে দৈত্যদের তাড়াইতে পারিলেন না। দেবমাতা

অদিতি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। অদিতি বলিলেন—"বৎস, তুমি ছাড়া ত' আমার ছেলেদের আর স্বর্গরাজ্য ফিরে পাওয়ার উপায় দেখছি না। তুমি একটা উপায় কর।"

বিষ্ণু বলিলেন—"মা, প্রতিকার করবার জন্য তোমার গর্ভেই আমি এবার জন্ম নেব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। এবার আমি বামন হ'য়ে জন্মাব।"

বিষ্ণু অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম লইলেন।

কয়েক বৎসর পরের কথা। নর্ম্মদাতীরে ভৃগুকচ্ছ নামক স্থানে বলি একটি বিরাট যজ্ঞ করিলেন। সে যজ্ঞে বলি যে যাহা চাহিতেছিল, তাহাই দান করিতেছিলেন। বামনদেব সেই যজ্ঞস্থলে অতিথি হইলেন। বলি বামনদেবকে সমাদর করিয়া পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে ব্রাহ্মণ, আপনার প্রার্থনা কি? যা চান তা-ই পাবেন।"

বামন বলিলেন—"আমার প্রার্থনা সামান্য। আমি ধনরত্ন চাই না, আমি চাই সামান্য ত্রিপাদ ভূমি।"

শুক্রাচার্য্য দেখিয়া বুঝিলেন—এই বামন নিশ্চয় ছদ্মবেশী বিষ্ণু। ইঁহার উদ্দেশ্য ভাল নয়। বলিকে তিনি বলিলেন—"মহারাজ, সাবধান! এই বামন যা চাইবে, তা-ই দিতে সম্মত হবেন না। এই বামন এসেছে আপনাকে ছলনা করতে।"

বলি বলিলেন—"আমি যখন অঙ্গীকার করেছি, তখন ইনি যা চান, তা-ই দেবই।"

দান করিবার আগে আচমন করিতে হয়। আচমনের জল যাহাতে বলি না পান, সেজন্য শুক্রাচার্য্য ভৃঙ্গারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জলরোধ করিলেন। ভৃঙ্গার ভরা, অথচ জল পড়ে না! তখন বামন একটি কুশ লইয়া ভৃঙ্গারের নলের মধ্যে খোঁচা

দিলেন—তাহাতে শুক্রাচার্য্যের একটি চোখ কানা হইয়া গেল। যাহাই হোক, বলি আচমন করিয়া দানে উদ্যত হইলেন। বামনদেব তখন বিশ্বরূপ ধারণ করিলেন। এক পায়ে তিনি পৃথিবী, অন্য পায়ে তিনি স্বর্গ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার নাভিদেশ হইতে তৃতীয় একটি চরণ নিঃসৃত হইল।

বামনদেব বলিলেন—"এই পদটি কোথায় ফেলব, দৈত্যরাজ?"

প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, রক্তের মধ্যে হরিভক্তি ছিল—সেই ভক্তির চরম নিদর্শন দেখাইবার সময় আসিয়াছে। বলি তৃতীয় পদের জন্য নিজের মাথা পাতিয়া দিলেন।

ত্রিবিক্রম বামনদেব বলির মাথার উপর তৃতীয় পদ রাখিলেন।

বলি চিরদিনের জন্য বন্দী হইলেন।

স্বর্গমর্ত্ত্যে আর বলির ঠাঁই হইল না। বলি পাতাল আশ্রয় করিলেন। তিনি পাতালের রাজা হইয়াই থাকিলেন। দেবতারা বামনের ছলনায় স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন। হরিও চিরদিনের জন্য বলির কাছে বন্দী হইয়া রহিলেন।

[স্কন্দপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, বামনপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, পদ্মপুরাণ]

বাণ রাজার কাহিনী

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, বিরোচনের পুত্র বলি, বলির জ্যেষ্ঠপুত্র বাণ। দৈত্যগণ সকলেই তপস্যার দ্বারা শক্তি অর্জ্জন করিত। এই শক্তিকেই ব্রহ্মা কিংবা শিবের বরপ্রভাবে প্রাপ্ত শক্তি বলা হইত।

বাণ কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করেন। মহাদেব বাণকে বর দিতে চাহিলে বাণ বলেন—"প্রভু, আমি আর কোন বর চাই না, আমাকে আপনি পুত্ররূপে গ্রহণ করুন।"

সেই হইতে শিব তাঁহাকে পুত্রতুল্য মনে করিতেন। বাণের রাজধানী ছিল শোণিতপুর। শিবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া বাণ অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বর্গরাজ্য আক্রমণ না করিলেও দেবতারা তাঁহার ভয়ে কম্পমান থাকিতেন।

বাণ সর্ব্বদা যুদ্ধ চাহিতেন। যেখানে দেব ও দৈত্যের যুদ্ধ বাধিত, সেইখানেই বাণ গিয়া দৈত্যপক্ষে যোগ দিয়া ভীষণ যুদ্ধ করিতেন। যখনই বিপন্ন হইতেন, মহাদেবকে স্মরণ করিতেন। মহাদেব গিয়া

রক্ষা করিতেন। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনের মত বাণেরও সহস্র বাহু ছিল। সহস্র বাহুতে সহস্র অস্ত্র ধরিয়া বাণ যুদ্ধ করিতেন।

বাণ যুদ্ধের পিপাসা মিটাইবার জন্য দিগ্‌বিজয়ে যাত্রা করিলেন। কংসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া তিনি বিপন্ন হইলেন। মহাদেব আসিয়া কংসকে বলেন—"ভূতলে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া বাণকে কেহ পরাজিত করতে পারবে না—পরশুরাম বাণকে এই বর দিয়ে বৈষ্ণব ধনু দান করেছেন, অতএব তুমি বাণের সঙ্গে যুদ্ধে নিবৃত্ত হও। তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমি বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রে দিতে এসেছি।" ইহার ফলে দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল।

বাণের কন্যা উষা। শঙ্করী উষাকে বলিলেন—"বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর রাত্রে স্বপ্নে তুমি যাকে দেখবে, সে-ই তোমার স্বামী হবে।"

উষা স্বপ্নে যাহাকে দেখিলেন, তাহার চিত্র আঁকিয়া সখী চিত্রলেখাকে দিলেন। চিত্রলেখা ভারতবর্ষের সকল রাজপুত্রের চিত্র আনাইয়া মিলাইয়া দেখিলেন, স্বপ্নে দৃষ্ট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধকে এ সংবাদ দিলে তিনি শোণিতপুরে আসিলেন এবং গোপনে উষাকে বিবাহ করিলেন।

বাণ রাজা যখন জানিতে পারিলেন, শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র গোপনে তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন তিনি অনিরুদ্ধকে বধ করিবার আদেশ দিলেন। অনিরুদ্ধ একাই প্রহরীদের ও বাণ-রাজার সেনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাস্ত করিলেন। তখন বাণ নিজেই অনিরুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দী করিলেন। এ সংবাদ চিত্রলেখা দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে জানাইল।

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তখন যাদবসেনা লইয়া উপস্থিত হইলেন। বাণ অনিরুদ্ধকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে মন্ত্রী বলিলেন—

"মহারাজ, আপনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ব'লে গণ্য। আপনি আপনার গৃহে বন্দী অন্য এক বীর কুমারকে হত্যা করলে আপনার বীরখ্যাতিতে কলঙ্ক হবে। এভাবে অসহায় বন্দীকে হত্যা করা কাপুরুষের কাজ। তা ছাড়া, গোপনে বিবাহ হ'লেও অনিরুদ্ধ আপনার জামাতা। আপনি জামাতা ব'লে স্বীকার না করলেও আপনার কন্যা বিধবা হবে। আপনি মহাদেব বা মহাদেবীকে জিজ্ঞাসা না ক'রে এমন কাজ করবেন না।"

বাণ তাহাতে নিরস্ত হইলেন। এদিকে যাদবসৈন্য আসিয়া পড়িল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ রাজার তুমুল যুদ্ধ হইল। বাণ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পরাস্ত হইলেন—তখন তিনি মহাদেবকে স্মরণ করিলেন। মহাদেব আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। মহাদেবের আদেশে বাণ অনিরুদ্ধকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণের সন্ধি স্থাপিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র ও পৌত্রবধূকে লইয়া দ্বারকা যাত্রা করিলেন।

বাণের যুদ্ধের পিপাসা এত বেশি ছিল যে, তিনি মহাদেবের পুত্র কার্ত্তিকেয়ের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেবাসুর-যুদ্ধে বাণ কার্ত্তিকেয়কে বাধা দিবার জন্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতকে আশ্রয় করেন। কার্ত্তিক ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে আগুন লাগাইয়া দেন। তখন বাণ সসৈন্যে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন।

কার্ত্তিকের শরে বাণ নিহত হইলেন। মহাদেবের অভিশাপে তাঁহার শোণিতপুরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

[বাণ রাজার কাহিনী ভাগবত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদিতে আছে]

দক্ষযজ্ঞ

দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র—ইনি একজন প্রজাপতি। মহামায়াকে কন্যারূপে পাইবার জন্য দক্ষ বহু বৎসর তপস্যা করেন। মহামায়া তপস্যায় তুষ্ট হইয়া সতীরূপে দক্ষের পত্নী প্রসূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

সতীর বিবাহের জন্য দক্ষ স্বয়ংবরসভা আহ্বান করেন। সেই সভায় দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ—সকলেই আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। শিবের প্রতি দক্ষের শ্রদ্ধা ছিল না। শিবকে তিনি আমন্ত্রণ করেন নাই। শিব অন্তরীক্ষে থাকিয়া স্বয়ংবর অনুষ্ঠান দেখিতেছিলেন। সতী বরমাল্য হস্তে

সভায় আসিয়া. শিবকে দেখিতে না পাইয়া 'নমঃ শিবায়' বলিয়া মাল্য মাটিতে নিক্ষেপ করেন। শিব তখন অন্তরীক্ষ হইতে নামিয়া আসিয়া ভূতল হইতে মাল্য কুড়াইয়া লইয়া তাহা কণ্ঠে ধারণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

এই ব্যাপার হইতে সতীর প্রতি দক্ষের স্নেহ ছিল না। তারপর এক যজ্ঞে দক্ষ উপস্থিত হইলে সকলেই দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্বাগত জ্ঞাপন করিলেন। কেবল ব্রহ্মা ও শিব উঠিলেন না। ব্রহ্মা পিতা, তাঁহার উঠিবার কথা নয়, কিন্তু শিব জামাতা—তিনি শ্বশুরকে সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে দক্ষ কুপিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"এই দেবাধম শিব যেন বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতির মত যজ্ঞভাগ না পায়।"

শিব কোন উত্তর করিলেন না। নন্দী ইহাতে কুপিত হইয়া দক্ষ ও দক্ষের অনুবর্ত্তীদের অভিশাপ দিলেন। এইরূপ শাপশাপান্তে বিরক্ত হইয়া শিব যজ্ঞস্থল হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

দক্ষ এইবার শিবকে প্রকাশ্যে অবমাননা করিবার জন্য এক বিরাট যজ্ঞ করিলেন। এই যজ্ঞে তিনি সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, সকল জামাতা ও কন্যাকে সমাদর করিয়া আনাইলেন। কেবল শিব ও সতীকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। নারদের মুখে সতী এই যজ্ঞের সংবাদ পাইলেন। পিতার সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করিবার জন্য সতী বিনা নিমন্ত্রণেই পিত্রালয়ে আসিতে চাহিলেন। শিব অনুমতি দিলেন না। ইহাতে সতী কুপিত হইয়া ভীষণ মহাকালীরূপ ধারণ করিলেন। মহাদেব তাহাতে ভয় পাইয়া বলিলেন—"তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, দেবি।"

সতী নন্দীর সঙ্গে বৃষভে চড়িয়া দক্ষালয়ে পৌঁছিলেন। সকল কন্যাই আসিয়াছে, সতী আসে নাই। এজন্য প্রসূতির মনে শান্তি

ছিল না। সতীকে পাইয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইলেন। সতী প্রণাম করিয়া যজ্ঞক্ষেত্রে পিতার কাছে বসিলেন। সতীকে দেখিয়া দক্ষ উল্লাস প্রকাশ করিলেন না।

সতী পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এ যজ্ঞে আমাদের নিমন্ত্রণ করিলে না কেন?"

দক্ষ বলিলেন—"শিব শ্মশানবাসী, কপালী, সে সর্ব্বদা অশুচি হয়ে থাকে, তার বেশভূষা দেবতার উপযুক্ত নয়, ভূতপ্রেত পিশাচ নিয়ে বিহার করে, তার রুচি অত্যন্ত জঘন্য। তাকে জামাতা ব'লে পরিচয় দিতে ঘৃণা হয়। অন্যান্য দেবদেবীর মধ্যে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনা আমি সঙ্গত মনে করি নি।"

পতিনিন্দা শুনিয়া সতী বলিলেন—"তোমার তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তোমার অনাদর আজ অসহ্য হয়েছে, অতএব তোমা থেকে পাওয়া এ দেহ আমি আর রাখব না।"

দক্ষ ইহাতে ভয় পাইলেন। যজ্ঞস্থলে সতী দেহত্যাগ করিলে যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে—তারপর মহাদেব যখন একথা শুনিবেন, তখন আরো বিপদ ঘটিবে। দক্ষ সতীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সতী যোগাসনে বসিয়া নিজের দেহের তেজের অগ্নিশিখায় নিজে দগ্ধ হইলেন। চারিদিক হইতে হাহাকার পড়িয়া গেল।

সতীর সঙ্গে শিবের যে অনুচরগণ আসিয়াছিল, তাহারা যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিল। ভৃগুমুনি যজ্ঞ হইতে ঋভুদের সৃষ্টি করিলেন। তাহারা শিবের অনুচরদের বিতাড়ন করিল। কৈলাসে এ সংবাদ পৌঁছিলে শিব ক্রোধে একটি জটা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই জটা হইতে বীরভদ্র নামে এক বীরের আবির্ভাব হইল।

বীরভদ্র শিবের আদেশে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইল। বীরভদ্র যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন নষ্ট করিয়া যজ্ঞের হোতাদের কাহারও দাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিল, কাহারও দাঁত ভাঙিয়া দিল, কাহারও চোখ উপড়াইয়া লইল। আর, দক্ষের মুণ্ড কাটিয়া ঐ মুণ্ড যজ্ঞের অগ্নিতে ফেলিয়া দিল। ইতিমধ্যে ব্রহ্মা ও শিব দুই জনেই উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা শিবকে শান্ত করিলেন। একটি ছাগের মুণ্ড কাটিয়া সেই মুণ্ড দক্ষের স্কন্ধে স্থাপন করা হইল। শিববিদ্বেষের দণ্ডস্বরূপ দক্ষ এখন হইতে ছাগমুণ্ড হইয়া থাকিলেন।

মহাদেব সতীদেহকে স্কন্ধে ধারণ করিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে সমগ্র সৃষ্টি টলমল করিতে লাগিল। শিবের স্কন্ধ হইতে সতীদেহ না সরাইতে পারিলে আর রক্ষা নাই। তখন বিষ্ণু তাঁহার চক্র দিয়া সতীদেহকে একশত ভাগে বিভক্ত করিয়া ভারতবর্ষময় ছড়াইয়া দিলেন। যেখানে যেখানে সে সব খণ্ড পড়িয়াছে, সেখানে সেখানে মহাপীঠ-তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

[দক্ষযজ্ঞের কাহিনী বায়ুপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, শিবপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ, মহাভারত, ভাগবত, বামনপুরাণ ইত্যাদি বহু পুরাণেই আছে।]

সাবিত্রী সত্যবান

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে মদ্র নামে একটি দেশ ছিল। অনেকে মনে করেন বর্ত্তমান মাদ্রাজ বুঝি মদ্র-দেশ। কিন্তু তাহা নয়। মদ্রদেশ ছিল পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী একটি দেশ। এই মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সাবিত্রী দেবীর আরাধনা করিয়া ইনি একটি কন্যা লাভ করেন। উপাস্যা দেবীর নাম অনুসারে এই কন্যার নাম রাখেন সাবিত্রী।

সাবিত্রী যৌবনপ্রাপ্তা হইলে পিতা সাবিত্রীর মতো অপূর্ব্বরূপবতী ও গুণবতী কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে

লাগিলেন। কিন্তু যোগ্য পাত্রের সন্ধান না পাইয়া অশ্বপতি শেষে সাবিত্রীকেই বলিলেন—"মা, তোমার যোগ্য পতি তুমিই নির্ব্বাচন কর।"

সাবিত্রী রথে আরোহণ করিয়া যোগ্য পতির সন্ধানে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"শালদেশের রাজা দ্যুমৎসেন বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে এবং রাজ্য হারিয়ে তপোবনে বাস করছেন। তাঁর পুত্র সত্যবানকে আমি পতিরূপে নির্ব্বাচন ক'রে এসেছি! সত্যবান তপোবনে বাস ক'রে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করেন।"

পিতা বলিলেন—"তুমি রাজকন্যা, রাজ্যহারা বনবাসীকে বিয়ে ক'রে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ ক'রে তুমি বনে গিয়ে বাস করবে কোন্ দুঃখে? তুমি এমন পতি নির্ব্বাচন করলে কেন?"

সাবিত্রী বলিলেন—"পিতঃ, স্বামীর সঙ্গে বনে বাস করতে আমার কোন কষ্টই হবে না। আমার সংকল্প বিচলিত হবে না।"

পিতা বলিলেন—"তা-ই হবে, মা। তোমাকে যখন এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি, তখন আমার কিছু বলবার নেই।"

কয়েক দিন পরে নারদ আসিলেন। নারদ অশ্বপতির মুখ হইতে সাবিত্রীর সংকল্পের কথা শুনিলেন। তিনি শুনিয়া বলিলেন—"সাবিত্রী সর্ব্বনাশ করেছে! সত্যবানের যে মাত্র আর এক বৎসর আয়ু! এক বৎসর পরে যে সাবিত্রী বিধবা হবে!"

অশ্বপতি একথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি নারদের সম্মুখেই সাবিত্রীকে ডাকিলেন। সাবিত্রী নারদের মুখ হইতেই ঐ দুঃসংবাদ শুনিলেন।

অশ্বপতি বলিলেন—"বৎসে, কিছুতেই এ বিবাহ হ'তে পারে না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান। তুমি বরং চিরদিন অবিবাহিতা

থাক, কিন্তু এই অল্পায়ু সত্যবানকে বিবাহ করতে পারবে না। মহর্ষি নারদের বাক্যে অপ্রত্যয় করবার ত' কারণ নেই। জেনে শুনে এমন পাত্রকে কোন' বুদ্ধিমতী নারী বিবাহ করতে পারে না।"

সাবিত্রী বলিলেন—"পিতঃ, আমার সংকল্প টলবে না। সত্যবানকে যখন আমি মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি, তখন তাঁকেই বিবাহ করব। যদি বৈধব্য কপালে থাকে, তবে তা-ই হবে। মৃত্যুর সঙ্গে আমি সংগ্রাম করব।"

নারদ বলিলেন—"রাজন্, সাবিত্রীকে নিবৃত্ত করা যাবে না। দৈবের বিধান—কি করবেন, বলুন। বিবাহ দেওয়াই স্থির করুন।"

অশ্বপতি অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে সম্মতি দিলেন। তিনি নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলেন—"আমারই দোষে এই দুর্ঘটনা ঘটতে চলল! হায়, কেন আমি সাবিত্রীকে পতি নির্ব্বাচনে স্বাধীনতা দিয়েছিলাম!"

অশ্বপতি তপোবনে গিয়া দ্যুমৎসেনের কাছে সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। নারদের কথা কিছুই বলিলেন না। দ্যুমৎসেন সম্মতি দিলেন এবং শুভদিনে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর সাবিত্রী তপোবনে গিয়া পতির সহিত বাস করিবার সংকল্প জানাইলেন।

অশ্বপতি বলিলেন—"মা, তুমি ও সত্যবান দু'জনেই রাজ-প্রাসাদেই থাক। আমারও পুত্র নেই, সত্যবানই আমার পুত্র হ'ল।"

সাবিত্রী বলিলেন—"তা ত' হয় না, পিতঃ। আমার বৃদ্ধ শ্বশুর ও বৃদ্ধা শাশুড়ীর কি হবে?"

অশ্বপতি বলিলেন—"আমি তাঁদেরও রাজপুরীতে নিয়ে আসব।"

সাবিত্রী বলিলেন—"তাঁরা তপোবনে থেকে সাধনভজন করছেন। রাজপুরীতে আনতে চাইলে তাঁরা আসবেন কেন?"

অশ্বপতি বাধ্য হইয়া সাবিত্রীকে তপোবনে প্রেরণ করিলেন।

সাবিত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিয়া তপোবনেই বাস করিতে লাগিলেন। পিতা তেজস্বিনী কন্যাকে আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না।

সাবিত্রী বিবাহের পর হইতে দিন গণনা করিতে লাগিলেন। এক বৎসর পূর্ণ হওয়ার চারিদিন আগে সাবিত্রী ত্রিরাত্র ব্রত করিলেন। চতুর্থ দিনের প্রভাতে উঠিয়া যথাবিধি হোমক্রিয়া করিয়া তিনি অনশনে থাকিলেন।

বেলা বাড়িলে সত্যবান কুঠার হস্তে ফল ও কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। সাবিত্রী কিছুতেই ছাড়িলেন না, তিনি সত্যবানের সঙ্গে গেলেন।

সত্যবান যখন কাঠ কাটিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার শিরঃপীড়া হইল, তিনি আর কুঠার চালাইতে পারিলেন না। সাবিত্রীর কোলে মাথা রাখিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন। এমন সময় শ্যামবর্ণ রক্তবস্ত্র রক্তচক্ষু এক বিরাট পুরুষ পাশ হস্তে সাবিত্রীর নিকটে আসিলেন।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কে প্রভু?"

বিরাট পুরুষ বলিলেন—"আমি যম, সত্যবানের আয়ু শেষ হয়েছে, তাঁকে আমার পুরীতে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।"

সাবিত্রী এই আশঙ্কাই করিতেছিলেন। তিনি অধীরা না হইয়া বলিলেন—"যার আয়ু শেষ হয়, তাকে ত' আপনার দূতগণই নিতে আসে, আপনি স্বয়ং এলেন কেন?"

যম বলিলেন—"যমদূতদের শক্তি নেই তোমার কোল থেকে সত্যবানকে নিয়ে যেতে। এজন্য আমি নিজেই এসেছি, বৎসে! আমি নিরুপায়, বিধির বিধান আমি পালন করতে বাধ্য।"

যম তখন সত্যবানের দেহ হইতে প্রাণপুরুষকে আকর্ষণ করিয়া পাশে আবদ্ধ করিয়া যাত্রা করিলেন। সত্যবানের দেহ প্রাণহীন হইয়া পড়িল।

সাবিত্রী যমের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। যম বলিলেন—"তুমি ফিরে গিয়ে সত্যবানের দেহের সৎকার করগে, যাও। বৃথা কেন আমার পিছু পিছু আসছ?"

সাবিত্রী বলিলেন—"আমার স্বামীর যে গতি, আমারও সেই গতি, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাব।"

সাবিত্রী যমরাজের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করিতে করিতে চলিলেন। যমরাজ সাবিত্রীর বাক্যে তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বৎসে, তোমার পতিভক্তি দেখে আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার যুক্তিও খুব সরল। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া যে কোন বর চাবে, তা দেব।"

সাবিত্রী বলিলেন—"প্রভু, যদি প্রসন্ন হ'য়ে থাকেন, তবে আমার শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসুক। তিনি তাঁর হৃতরাজ্য যেন ফিরে পান এবং আমার পিতার যেন শতপুত্র হয়।"

যমরাজ বলিলেন—"তথাস্তু। এইবার ফিরে যাও বৎসে!"

সাবিত্রী কিন্তু ফিরিলেন না। তিনি সতী, একনিষ্ঠ সতীত্বের যাহা প্রাপ্য, তাহাই তিনি চাহিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন—"প্রভু, সত্যবান কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করবার জন্য অল্পায়ু হয়েছে। আমি কি অপরাধ করেছি, বলুন? আমি কেন চিরদিন বৈধব্যদুঃখ ভোগ করব? আমার ত' কোন সান্ত্বনা নেই! আমার কোলে একটি শিশুসন্তানও নেই!"

যম বলিলেন—"বৎসে, তুমি সান্ত্বনার জন্য যে বর খুশি চেয়ে নিতে পারো—তবে সত্যবানের জীবন আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দিতে পারব না।"

সাবিত্রী বলিলেন—"প্রভু, আমার যেন একশত পুত্র হয়। আমাকে এই বর দিন!"

যম বলিলেন—"তথাস্তু, এইবার ফিরে যাও, বৎসে!"

সাবিত্রী বলিলেন—"প্রভু, একি আদেশ করছেন আমাকে? আমার স্বামীকে নিয়ে চললেন, আমার একশত পুত্র কি ক'রে হবে? আমি সতী নারী, আমি ত অন্য পতি গ্রহণ করতে পারি না। আপনি ধর্ম্মরাজ, আমাকে সে আদেশ নিশ্চয়ই দেবেন না।"

যমরাজ নিজের ফাঁদে নিজেই বাঁধা পড়িলেন। তিনি বলিলেন—"বৎসে, তুমি আমাকে পরাভূত করেছ। তুমি ফিরে যাও, ফিরে গিয়ে দেখবে—সত্যবান পুনর্জীবিত হয়েছে। তোমার ভয়েই আমি নিজে সত্যবানকে নিতে এসেছিলাম। তোমার কাছে আমার পরাভব হ'লো। সত্যবান শতায়ু লাভ করলেন। তোমার মত তেজস্বিনী সতীই বিধির বিধান ব্যর্থ করতে পারে।"

সাবিত্রী এবার ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—সত্যবান তাঁহারই অনুসন্ধান করিতেছেন।

সত্যবান বলিলেন—"দেবি, আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলাম—তুমি এ অবস্থায় আমাকে ফেলে কোথায় গিয়েছিলে?"

সাবিত্রী একবার ভাবিলেন, মুখে জল দেওয়ার জন্য জল আনিতে গিয়াছিলেন—তাহাই বলিবেন। কিন্তু মিথ্যা কথা তাঁহার মুখ দিয়া নির্গত হইল না। তিনি সব কথা স্বামীকে বলিলেন।

তারপর তাঁহারা তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন—দ্যুমৎসেন দৃষ্টি ফিরিয়া পাইয়া তাঁহাদের সন্ধান করিতেছেন। সেই রাত্রিতেই মন্ত্রী আসিয়া সংবাদ দিলেন—শত্রুসৈন্যকে পরাভূত করিয়া তিনি শাল্বরাজ্য উদ্ধার করিয়াছেন।

দুর্ব্বাসা ঋষি এমনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভয়ে মানুষের ত' কথাই নাই, দেবদানব যক্ষরক্ষ সকলেই কাঁপিত। অভিশাপ দিলে তপের ক্ষয় হয়, সেইজন্য তপস্বীরা সহজে অভিশাপ দিতেন না। দুর্ব্বাসার তপোবল এত বেশি ছিল যে, বারবার অভিশাপ দিয়াও তাঁহার তপের ফল নিঃশেষ হইত না। তপস্যার বলে তিনি অতিদীর্ঘজীবনও লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁহার অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পান নাই।

দুর্ব্বাসা একবার এক বিদ্যাধরীর কাছ হইতে একটি সন্তানক পুষ্পের মাল্য চাহিয়া লইয়াছিলেন। সন্তানক কেবল স্বর্গের নন্দনবনেই ফুটিত। এই মাল্য গলায় দিয়া দুর্ব্বাসা চলিয়াছেন, যাইতে যাইতে দেখেন, ইন্দ্র তাঁহার রাজহস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া চলিয়াছেন। দুর্ব্বাসাকে দেখিয়া ইন্দ্র হস্তিপৃষ্ঠে থাকিয়াই প্রণাম জানাইলেন। দুর্ব্বাসা আশীর্ব্বাদচ্ছলে গলার সন্তানকমাল্যটি ইন্দ্রের দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। ইন্দ্র সেই মাল্যটি হস্তীর মস্তকে ঝুলাইয়া দিলেন। যে মালা ঋষি নিজে গলায় পরিয়াছিলেন, সে

মাল্য ইন্দ্র গলায় পরিলেন না। হস্তী ঐ মাল্য শুঁড়ে জড়াইয়া লইয়া ভূমিতলে ফেলিয়া দিল এবং হস্তীর পায়ের তলায় তাহা দলিত হইল।

দুর্ব্বাসা তাঁহার মালার পরিণাম দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ইন্দ্রকে অভিশাপ দিলেন—"তুমি শ্রীভ্রষ্ট হও, স্বর্গরাজ্যের লক্ষ্মীশ্রী দূর হ'য়ে যাক।"

দুর্ব্বাসার অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নয়। লক্ষ্মী স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া সাগরতলে আশ্রয় লইলেন। স্বর্গের আর কোন শ্রী থাকিল না। নন্দনবন শুকাইয়া গেল, মন্দাকিনী শুকাইয়া গেল, কল্পতরু আর প্রার্থনা পূরণ করিল না, সুরভি আর কাম্যধন প্রসব করিল না, দিন দিন দেবতারা হীনবল হইতে আরম্ভ করিলেন। স্বর্গের আর কোন মহিমা থাকিল না। সুবিধা পাইয়া দৈত্যেরা স্বর্গ অধিকার করিল। দেবতারা দৈত্যভয়ে মর্ত্ত্যে ও পাতালে আশ্রয় লইতে লাগিলেন। স্বর্গের কিন্নরী-অপ্সরীরা দৈত্যদের দাসী হইয়া রহিল।

লক্ষ্মীছাড়া দেবতারা এখন ভবঘুরে। একদিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া ব্রহ্মার নিকট গিয়া বলিল—"পিতামহ, আপনি ত' ব্রহ্মলোকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে রয়েছেন। আমরা স্বর্গরাজ্য হারিয়ে লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে কত কাল ঘুরব? দৈত্যদের হাত হ'তে স্বর্গরাজ্য-উদ্ধারের কি উপায় বলুন।"

ব্রহ্মা বলিলেন—"দেখ, তোমরা স্বর্গরাজ্য পেয়ে দিব্য আরামেই ছিলে। তোমাদের কোন উদ্যম নেই, কোন কর্ম্মশক্তি নেই। বিনা উদ্যমে স্বর্গরাজ্য ফিরে পেতে পার না চল, বিষ্ণুর কাছে যাই। তিনিই ত' লক্ষ্মীর অধিকারী, তাঁর কাছে গিয়ে উপদেশ নেওয়া চাই।"

তখন দেবতারা ব্রহ্মাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর কাছে গেলেন। বিষ্ণু ক্ষীরোদসাগরে শয়ান ছিলেন। দেবতারা স্তব করিয়া তাঁহাকে জাগাইলেন। দেবতারা তাঁহাদের দুঃখের কথা বিষ্ণুকে জানাইলেন।

বিষ্ণু বলিলেন—"দেখ, দৈত্যগণ খুব বলশালী, তারা তপের দ্বারা বল সঞ্চয় করেছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে তোমরা পারবে না। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে তোমরা দলে দলে মারা যাবে। তোমাদের অমর হ'তে হবে।"

ইন্দ্র বলিলেন—"প্রভু, অমর কি ক'রে হওয়া যায়?"

বিষ্ণু বলিলেন—"মহাসাগরের জলে অমৃত আছে। সেই অমৃত উদ্ধার করলে তোমরা অমৃতপানে অমর হ'তে পারবে। আর লক্ষ্মীও আছেন—সাগরের তলে। তাঁকেও ফিরিয়ে আনতে পারবে।"

ইন্দ্র—কি ক'রে সে অমৃত লাভ করা যাবে, আর লক্ষ্মীকেও কি ক'রে ফেরানো যাবে বলুন।

বিষ্ণু—এজন্য সমুদ্রমন্থন করতে হবে। সমুদ্রমন্থন করলে শুধু অমৃত ও লক্ষ্মী নয়, আরো অনেক কিছু পাবে।

ইন্দ্র—কি ক'রে সমুদ্রমন্থন করা যাবে, তা ত' আমরা জানি না।

বিষ্ণু—মন্দর পর্ব্বতকে সমুদ্রে বসাতে হবে। বাসুকিকে জড়িয়ে দাও তার গায়ে। তারপর বাসুকির লেজের দিক ধরো একদল, আর মাথার দিক ধরো আর একদল। মন্দর হবে মন্থনদণ্ড। তারপর যেমন ক'রে দধিমন্থন ক'রে ননী তোলা যায়, তেমনি ক'রে মন্থন করতে হবে। দৈত্যদের বলো—এই মন্থনে সাহায্য করলে তাদের অমৃতের ভাগ দেওয়া হবে। তাদের

বাসুকির মাথার দিকটা ধরতে দাও, তোমরা লেজের দিক ধরো। তারপর চালাও মন্থন দিনরাত।

ইন্দ্র—দৈত্যদের অমৃতের ভাগ দিলে ত' ওরাও অমর হবে—তখন আমরা অমর হ'লেও কিছু করতে পারব না।

বিষ্ণু—ওদের দ্বারা কাজটা করিয়ে নাও, তারপর অমৃত ওরা াতে না পায়, তার ব্যবস্থা আমি করব।

ইন্দ্র—তা না হয় হ'ল, কিন্তু মন্দর পর্ব্বত টলমল ক'রে পড়ে যাবে। এই মন্দর পর্ব্বতকে ধ'রে রাখবে কে?

বিষ্ণু—তোমরা বাসুকির কাছে যাও। আমি কূর্ম্মরূপ ধ'রে মন্দর পর্ব্বতকে খাড়া রাখব। দৈত্যদের সঙ্গে দেখা ক'রে সব ঠিক ক'রে ফেলো।

দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে দেখা করিয়া সমুদ্রমন্থনের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ দুইদিকে দুইদল দাঁড়াইয়া মন্থনের কাজ আরম্ভ করিলেন। বহু বৎসর ধরিয়া অবিরত মন্থনের ফলে প্রথমে উঠিলেন চন্দ্র। দেবতা ও দৈত্যরা একসঙ্গে উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠিলেন, চন্দ্র গগনমণ্ডলে আশ্রয় লইলেন। তারপর উঠিল পুষ্পিত পারিজাত বৃক্ষ। সমস্ত জগৎ পারিজাতের গন্ধে আমোদিত হইল। পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গের নন্দনবনে চলিয়া গেল। তারপর ঐরাবত হস্তী ও উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উত্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র এই হস্তী ও অশ্বের অধিকারী হইলেন। তারপর স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হইল। সঙ্গে সঙ্গে কৌস্তভ মণি এবং রাশি রাশি মণিরত্নের আবির্ভাব হইল। তারপর বহু দিব্য বস্তুর আবির্ভাব হইল। দেবতারা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সব শেষে উঠিলেন ধন্বন্তরি—তাঁহার হাতে অমৃতকুম্ভ। অমৃতকুম্ভ দেখিয়া দেবগণ ও দৈত্যগণ মৃতপ্রায়

বাসুকিকে ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিল অমৃত-কুম্ভ অধিকার করিবার জন্য। বিষ্ণু এই সময়ে মোহিনীমূর্তি ধরিয়া দৈত্যগণকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া ধন্বন্তরির হাত হইতে অমৃত-কুম্ভ লইয়া অন্তর্হিত হইলেন।

এমন সময় মহাদেব আসিয়া উপস্থিত। তিনি আসিয়া দেবতাদের বলিলেন—"তোমরা আমাকে ডাকনি কেন? আমার ভাগে কি আছে, দাও।" দেবতারা একে একে যাহা যাহা পাওয়া গিয়াছে—সমস্তের হিসাব দিলেন। শিব বলিলেন—"আমি এসব নিয়ে কি করব? আমি আবার মন্থন চালাব।" শিব আবার দেবগণ ও দৈত্যগণকে লইয়া প্রবল মন্থন আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবার উঠিল কেবল হলাহল। এই হলাহল বাষ্পের আকারে ত্রিভুবন ছাইয়া ফেলিল। দেবতারা মহাদেবকে বলিলেন—"প্রভু আর মন্থন চলবে না, বন্ধ করুন। বিষে আমরা জ্বলে মরছি।"

মহাদেব তখন সেই সমস্ত বিষ নিজে পান করিলেন। এই বিষ তাঁহার কণ্ঠে সঞ্চিত হইয়া রহিল। মহাদেব সেই হইতে নীলকণ্ঠ।

এদিকে বিষ্ণু দেবতাদের অমৃত পান করাইয়া শূন্য ভাণ্ডটি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈত্যেরা অমৃত না পাইয়া দেবতাদের আক্রমণ করিল। ভীষণ যুদ্ধ বাধিল, দেবতারা অমৃতপানে অমর হইয়া গিয়াছেন। দৈত্যরাই দলে দলে মরিতে লাগিল। দৈত্যদের পরাজয় হইল। দেবতারা স্বর্গরাজ্য ফিরিয়া পাইলেন।

[বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ]

বিদর্ভদেশে ভীম নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দময়ন্তী নামে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। নিষধ দেশে এই সময় এক তরুণ রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম নল। ইনি যেমন রূপবান্ ও জ্ঞানী ছিলেন, তেমনি বীর ছিলেন। ইহা ছাড়া, ইঁহার রথচালনায় ছিল অপূর্ব্ব দক্ষতা।

একদিন নলরাজ তাঁহার উদ্যানবাটীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি রাজহংস মানুষের কণ্ঠস্বরে নলকে বলিল—"মহারাজ, আপনার সঙ্গে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তীর বিবাহ ঘটিয়ে দেব, আমাকে আপনার বিবাহের ঘটক ব'লে জানবেন। দময়ন্তীর মত রূপে গুণে অতুলনীয়া কন্যা আর কোন রাজপুরীতে নেই।"

রাজহংস তারপর উড়িয়া চলিয়া গেল বিদর্ভদেশে। বিদর্ভ-রাজের উদ্যানবাটিকার সরোবরে রাজহংস খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

দময়ন্তী সখীগণের সঙ্গে সেই সরোবরে স্নান করিতে আসিয়া রাজহংসটিকে ধরিলেন। রাজহংস বলিল—"রাজকুমারি, আমি তোমার বিবাহের ঘটক। আমি তোমার সঙ্গে নিষধরাজের বিয়ে দেব। নলরাজ যেমন সুপুরুষ, তেমনি বীর, আর তেমনি জ্ঞানী। তাঁর মতন রাজকুমার আর এদেশে নেই।"

দময়ন্তী এই রাজহংসের মুখে নলরাজের বীরত্বের খ্যাতি শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া রহিলেন। দময়ন্তীর পিতা দময়ন্তীর স্বয়ংবরের ব্যবস্থা করিলেন। রাজা নলও সভায় উপস্থিত হইলেন। দময়ন্তী নলের কণ্ঠেই বরমাল্য দিলেন। দেবতারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ভরসা করিয়াছিলেন—তাঁহাদের উপেক্ষা করিয়া দময়ন্তী নিশ্চয়ই মানুষকে বরণ করিবে না। তাঁহারা বড়ই রাগিয়া গেলেন। দেবতাদের অনুরোধে কলি নলের দেহে প্রবেশ করিল। এই কলিই নলের সর্ব্বনাশ করিল।

দময়ন্তীকে বিবাহ করিয়া নলরাজ নিষধরাজ্যের রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং কিছুকাল সুখেই কাটাইলেন। তাঁহার ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্যা জন্মিল।

পূর্ব্বকালে রাজাদের মধ্যে পণ রাখিয়া পাশা খেলার প্রথা ছিল। এমন মন্দ প্রথা আর দেখা যায় না। এক রাজা অন্য রাজার সহিত পাশা খেলিয়া অনায়াসেই তাঁহার রাজ্য, রাজ-ভাণ্ডার, হাতীঘোড়া সমস্তই জয় করিয়া লইতে পারিতেন। এমনি খেলার নেশা যে, খেলিতে খেলিতে রাজাদের মাথা ঠিক থাকিত না, তখন সর্ব্বস্ব পণ রাখিতেন। হারিলেই একেবারে পথের ভিখারী।

নলরাজের অনেক গুণ ছিল, কিন্তু তাঁহার নেশা ছিল পাশা খেলার। কলি তাঁহার দেহে প্রবেশ করিয়া এই নেশাকে বহুগুণে বাড়াইয়া দিল। একদিন ভ্রাতা পুষ্করের সঙ্গে পাশা খেলিতে গিয়া নলরাজ সর্ব্বস্ব পণ রাখিয়া হারিয়া গেলেন। দময়ন্তী কত বাধা দিলেন, কিছুতেই কিছুই হইল না। কলির প্রভাব নল এড়াইতে পারিলেন না।

নলরাজ তখন পথের ভিখারী হইয়া বিদর্ভনগরে পুত্রকন্যাকে পাঠাইয়া দিয়া দময়ন্তীর সঙ্গে বনে গেলেন। নল দময়ন্তীকে বাপের বাড়ীতে যাইবার জন্য অনুরোধ-উপরোধ করিলেন, কিন্তু দময়ন্তী কিছুতেই শুনিলেন না। তিনিও নলের সঙ্গে সঙ্গে বনে বনে ঘুরিতে লাগিলেন।

নলের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। নল ভাবিলেন, দময়ন্তীকে একা ফেলিয়া পলাইতে পারিলে দময়ন্তী বাধ্য হইয়া কোন প্রকারে পথ খুঁজিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবে,— নলও একা গভীর বনে প্রবেশ করিয়া তপস্যা করিতে পারিবেন। দময়ন্তীর দুঃখ নল আর দেখিতে পারিলেন না,—একদিন দময়ন্তী ঘুমাইয়া পড়িলে নল তাহাকে ছাড়িয়া পলাইলেন। দময়ন্তী জাগিয়া উঠিয়া স্বামীকে না দেখিয়া বনে বনে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, পার হইয়া দময়ন্তী এক বণিকদলের সঙ্গ পাইলেন। তাহাদের সঙ্গে তিনি চেদিরাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। চেদিরাজ বীরবাহুর রাণী একদিন দময়ন্তীকে পাগলিনীর বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। দময়ন্তী বহুদিন পরে একটা আশ্রয় পাইলেন। দময়ন্তী কিন্তু এখানে তাঁহার পরিচয় গোপন রাখিলেন।

এদিকে বিদর্ভরাজ ভীম কন্যাজামাতার সন্ধানে দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন। তাহাদের মধ্যে একজন চেদিরাজ্যে আসিয়া দময়ন্তীর সন্ধান পাইয়া ভীমকে জানাইলেন। ভীম যখন রথ লইয়া চেদিরাজের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন চেদিরাজের মহিষী জানিতে পারিলেন, পাগলিনী তাঁহারই ভগিনীর কন্যা। দময়ন্তী আপন পরিচয় এত দিন গোপন রাখিয়াছিলেন।

দময়ন্তীর সন্ধান পাওয়া গেল, এখন নল গেল কোথায়, তাহার সন্ধান নাই। বিদর্ভরাজ তখন এক ফন্দী করিলেন—তিনি ভারতবর্ষের সকল রাজার কাছে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহার কন্যা দ্বিতীয় বার স্বয়ংবরা হইবেন। নলরাজ একজনকে দাবানল হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। তাহারই কৃপায় নল অযোধ্যায় আসিলেন। মহারাজ নল নানা বিপদ-আপদ অতিক্রম করিয়া অযোধ্যারাজ ঋতুপর্ণের গৃহে বাহুক নাম লইয়া সারথির কার্য্য করিতেছিলেন। ঋতুপর্ণও দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহারাজ নল তাঁহার রথের সারথি হইয়া বিদর্ভনগরে যাত্রা করিলেন। স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া তিনি বুঝিলেন—ইহা তাঁহার সন্ধানের জন্য একটি ফন্দী ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঋতুপর্ণ বিদর্ভে আসিয়া দেখিলেন, স্বয়ংবরের কোন আয়োজন নাই। ভীম আসল কথা ঋতুপর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন। নল বিদর্ভে আসিয়া দময়ন্তীকে লাভ করিলেন। পরে নিজ বাহুবলে ও শ্বশুরের সাহায্যে আপন রাজ্য জয় করিয়া সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

[মহাভারত]

পাঁচ বছরের ছেলে বাপের কোলে উঠিতে চায়, বাপও হাত দুইটি বাড়াইয়াছেন—এমন সময় ছেলের বিমাতা আসিয়া পড়িলেন। বাপ তাড়াতাড়ি হাত দুটি গুটাইয়া লইলেন।

বিমাতা ছেলেটিকে ধমক দিয়া বলিলেন—"এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর, তুই আমার সতীনেব পেটে জ'ন্মে বাপের কোলে উঠতে চাস্! বাপের কোলে উঠতে হ'লে হরির আরাধনা ক'রে আমার গর্ভে জন্মাবার সৌভাগ্য লাভ করতে হ'ত। বাপের আদর পেতে হ'লে তপস্যা চাই।"

এই পাঁচ বছরের ছেলেটির নাম ধ্রুব, পিতা রাজা উত্তানপাদ, আর বিমাতার নাম সুরুচি। রাজা উত্তানপাদের দুই স্ত্রী। বড় স্ত্রী সুনীতির পুত্র ধ্রুব। আর ছোট স্ত্রী সুরুচির পুত্রের নাম

উত্তম বাপের কোলেই অনেক সময় থাকে। রাজা সুরুচির বশীভূত। সুরুচির ভয়ে রাজা ইচ্ছা থাকিলেও ধ্রুবকে আদর করিতে পারেন না। ধ্রুব কাঁদিতে লাগিল—তাহাতেও রাজা ছেলেকে ডাকিয়া একটু আদর করিতে পারিলেন না।

ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কাছে গেলেন। সুনীতি কান্নার কারণ জানিতে পারিয়া বলিলেন—"বাছা, তোমার ছোটমা ঠিকই বলেছেন। হরির কৃপা ছাড়া বাপের আদরও পাওয়া যায় না। তুমি হরিকে ডাক।"

ধ্রুব দিনরাতই হরিকে ডাকেন আর প্রতিদিন মাকে বলেন—"কই মা, এত ডাকছি, হরি ত' আসছেন না!"

সুনীতি বলেন—"নিশ্চয়ই তিনি দেখা দেবেন, বাবা! এত তাড়াতাড়ি কি তাঁর কৃপা পাওয়া যায়?"

ধ্রুব শুনিয়াছিলেন—হরির কৃপার জন্য, লোকে বনে গিয়া তপস্যা করে। ধ্রুবেরও ইচ্ছা হইল বনে গিয়া তপস্যা করিবেন। তপস্যা কাহাকে বলে ধ্রুব তাহা জানেন না, তিনি জানেন আকুল হইয়া ডাকাই তাঁহার জন্য তপস্যা। এইভাবে কিছুদিন যায়, একদিন রাত্রে মা ঘুমাইয়া পড়িলে ধ্রুব বনের দিকে চলিয়া গেলেন।

পথে নারদের সঙ্গে দেখা। নারদ বলিলেন—"ধ্রুব, বাড়ী ফিরে চল, বনে গিয়ে তপস্যার বয়স এখন নয়। এখন বাড়ীতে থেকেই তাঁকে ডাকতে হয়।"

ধ্রুব কিছুতেই বাড়ী ফিরিবেন না, তিনি বনে যাইবেনই। তখন নারদ বলিলেন—"তবে এস আমার সঙ্গে। আমি এমন বনে তোমাকে নিয়ে যাব, যেখানে ফলজলের অভাব নেই, হিংস্র জীবজন্তু নেই।" এই বলিয়া নারদ যমুনাতীরের মধুবনে ধ্রুবকে রাখিয়া আসিলেন।

নারদ রাজপুরীতে গিয়া ধ্রুবর মাকে বলিলেন—“মা, তুমি ধ্রুবের জন্য ভেবো না—ধ্রুব মধুবনে গিয়ে মধুসূদনের নাম জপ করছে। হরি তাকে রক্ষা করবেন। আমিও সর্ব্বদাই তার কাছে কাছে থাকব।”

ধ্রুব সারা দিন “কোথায় হরি, দেখা দাও,” বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। কোন মানুষ, এমন কি জীবজন্তুর দেখা পাইলেও তাহাকে হরির কথা জিজ্ঞাসা করেন। নারদের সঙ্গে ধ্রুবের মাঝে মাঝে দেখা হয়, ধ্রুব বলেন—“ঠাকুর, হরি কোথায় আছেন? কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হয়? দেখা হলে ব'লো ঠাকুর, আমি খুব চেঁচিয়ে ডাকতে পারি না ব'লে কি তিনি শুনতে পাচ্ছেন না?”

নারদ বলেন—“তিনি শুনতে পান, আমাকে বলেছেন শীঘ্র তোমাকে দেখা দেবেন। তাঁকে অনেকে ডাকে কিনা, তাই সর্ব্বদাই তাঁকে ছুটোছুটি করতে হয়। সময় হ'লেই দেখা দেবেন।”

এইভাবে ধ্রুবের দিনের পর দিন কাটে। বনের মধ্যে কে একটা কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া দিয়াছে—কে মাটির কলসীতে জল রাখিয়া যায়—কে ফলমূল রাখিয়া যায়, ধ্রুব তাহা বুঝিতেই পারেন না। বনের সাপগুলো গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়, কিছুই বলে না। বনের পাখীরা আসিয়া হাতের উপর বসে। বাঘ-ভালুক পোষা কুকুরের মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এইভাবে পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। ধ্রুব হরির দেখা পাইলেন। হরি দেখা দিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাপের কোল তিনি পান নাই, কিন্তু হরির কোল পাইলেন। হরি বলিলেন—“ধ্রুব, এইবার বাড়ী যাও, তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে।”

ধ্রুব বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন বিমাতা। সুরুচি ধ্রুবকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"বাবা, তুই ফিরে এসেছিস। আমার দুর্ব্বাক্যে তুই বাড়ী ছেড়ে গিয়েছিলি—কি দুঃখে অনুতাপে যে ক'বছর কাটিয়েছি, তা আর কি বলব।"

ধ্রুব বলিলেন—"মা, তুমি হরির কথা স্মরণ করিয়ে না দিলে আমার জীবনটা ব্যর্থ হয়ে যেত। তুমিই আমাকে নতুন জীবন দিয়েছ—তুমি আমার এই নবজন্মের প্রসূতি।"

রাজা উত্তানপাদ ধ্রুবকে বুকে ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর সুনীতির চোখে আনন্দের অশ্রুধারা মন্দাকিনীর মত বহিয়া যাইতে লাগিল।

উত্তানপাদ ধ্রুবকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া তপস্যায় চলিয়া গেলেন। ধ্রুবের রাজ্য হইল ধর্ম্মরাজ্য। ধ্রুব তখন ধর্ম্মরাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজত্বে অকালমৃত্যু, অন্নাভাব, বন্যা বা কোন প্রাকৃতিক উপদ্রব ছিল না।

ধ্রুবকে জীবনে একটি ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে হইয়াছিল ভ্রাতার প্রতি স্নেহবশতঃ। ভ্রাতা উত্তম যক্ষহস্তে নিহত হয়। যক্ষদের শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি অলকাপুরী আক্রমণ করিয়া যক্ষদের বধ করিতে সুরু করেন। ইহাতে পিতামহ ব্রহ্মা ব্যথিত হইয়া ধ্রুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন—"একজন যক্ষের হাতে তোমার ভ্রাতা নিহত হয়েছে—এজন্য সমস্ত যক্ষপুরী তোমার ধ্বংস করা উচিত নয়।"

ইহাতে ধ্রুবের চৈতন্য হয়। ধ্রুব কুবেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কুবের তুষ্ট হইয়া ধ্রুবকে বরপ্রার্থনা করিতে বলেন। তাহাতে ধ্রুব প্রার্থনা করেন—"শ্রীভগবানে যেন

আমার অবিচলা মতি থাকে। ইহার বেশি আমি কিছুই চাই না।"

কুবের বলিলেন—"হাঁ, ইহাই ধ্রুবের উপযুক্ত প্রার্থনা বটে।" ধ্রুবের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উৎকল রাজা হইতে চাহেন নাই—সেজন্য ধ্রুব দ্বিতীয় পুত্র বৎসরের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যার জন্য গমন করেন। মৃত্যুর পর তিনি ধ্রুবলোকে স্থান পাইয়াছিলেন।

[ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ]

পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশে করন্ধম নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র অবীক্ষিতের তুল্য রূপবান্, গুণবান্ ও বীর্য্যবান্ রাজপুত্র সেকালে আর কেহই ছিলেন না।

বিদিশার রাজা ছিলেন বিশাল। তাঁহার অপূর্ব্বলাবণ্যবতী এক কন্যা ছিল। তাহার আসল নাম ভামিনী। বৈশালিনী নামেই সে ছিল খ্যাত। বহু রাজা ও রাজপুত্র এই ভামিনীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা চাহিয়াছিলেন—ভামিনী তাহার পতি নিজে নির্ব্বাচন করুক। বিশালরাজ এজন্য স্বয়ংবরসভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় সেকালের সকল রাজপুত্রই উপস্থিত হইলেন। কুমার অবীক্ষিতও আসিলেন।

অবীক্ষিত ভাবিলেন—রাজকন্যা কাহাকে বরণ করিবে স্থিরতা নাই। সে অনিশ্চয়তার মধ্যে না থাকিয়া 'নিজের বাহুবলে

কন্যাকে হরণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। অবশ্য সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে হইবে সকল রাজপুত্রের সঙ্গে। অবীক্ষিত নিজেকে অপরাজেয় মনে করিতেন।

কন্যা স্বয়ংবর-সভায় যখন প্রবেশ করিতে যাইবে, তখনই অবীক্ষিত কন্যাকে রথে তুলিয়া প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। প্রস্থান করা সহজ নয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্রেরাও গর্জ্জন করিয়া অবীক্ষিতকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। ভীষণ যুদ্ধ চলিল; একা অবীক্ষিত সকল রাজপুত্রকে বারবারই হারাইয়া দিলেন। ক্রমে অবীক্ষিতের তূণ শূন্য হইয়া গেল। বিশালরাজের সৈন্যসামন্তও আসিয়া পড়িল। অবীক্ষিত শেষ পর্য্যন্ত অচেতন হইয়া ভূতলে শায়িত হইলেন।

তখন রাজপুত্রেরা অবীক্ষিতকে বন্দী করিয়া রাজকন্যাসহ বিশালরাজের কাছে লইয়া আসিলেন।

এদিকে রাজা করন্ধম পুত্রের পরাজয় ও বন্দিদশার কথা শুনিয়া বহু সৈন্যসামন্তসহ উপস্থিত হইলেন। বিশালরাজের সৈন্যসামন্ত তাঁহার কাছে নগণ্য, রাজপুত্রেরা বেশি সেনা সঙ্গে আনেন নাই, নিজেরা সকলেই আহত কিংবা রণক্লান্ত। পরাজয় অনিবার্য্য বুঝিয়া বিশালরাজ করন্ধমের কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন।

তখন বিশালরাজ করন্ধমের কাছে প্রস্তাব করিলেন—অবীক্ষিতের সঙ্গে এখন ভামিনীর বিবাহ হউক—এ বিবাহে কোন বাধা নাই। করন্ধম সম্মত হইলেন, কিন্তু কুমার বলিলেন—"আমি যখন রাজকন্যার সমক্ষে পরাজিত হয়েছি, তখন আমি তাঁকে বিয়ে করতে পারব না।" কুমারের এই কথায় করন্ধম দুঃখিত হইলেন—বিশালরাজও দুঃখিত হইলেন। তখন

বিশালরাজ কন্যাকে বলিলেন—"বৎসে, তুমি এখন যে কোন রাজপুত্রকে বরণ কর, সকলেই উপস্থিত আছেন।"

ভামিনী বলিলেন—"বাবা, আমি কুমারের পরাজয়কে পরাজয় মনে করি না, বিজয়ই মনে করি। একা তিনি বহু রাজপুত্র ও সৈন্যসামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, তা কোন মানুষে সম্ভব ব'লে মনে হয় না। আমি ঐ রাজকুমারকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি—অন্য কাকেও আমি বিবাহ করতে পারব না।"

অবীক্ষিত একথা শুনিয়াও বিবাহে সম্মত হইলেন না। দুই রাজাই অবীক্ষিতকে কত অনুরোধ করিলেন। অবীক্ষিত অচল, অটল। করন্ধম ক্ষুব্ধচিত্তে স্বরাজ্যে ফিরিয়া গেলেন।

বিশালরাজ কন্যাকে বলিলেন—"মা, তা'হলে তুমি কি করবে? চিরদিন কুমারী হ'য়ে থাকবে?"

ভামিনী বলিল—"আমি তপস্যা করব। তপস্যার দ্বারা ঐ কুমারকেই পতিরূপে লাভ করব।"

ভামিনী রাজপুরী ত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসিনী হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ভামিনীর শরীর শীর্ণ হইল, রূপ-যৌবন মলিন হইয়া গেল, তপস্যায় কোন ফললাভ হইল না। তখন ভামিনী প্রাণত্যাগের সংকল্প করিলেন। এমন অবস্থায় তিনি আকাশবা শুনিলেন—"প্রাণরক্ষা কর, রাজকুমারি! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে।"

ভামিনীর মনে আশার সঞ্চার হইল—ভামিনী দ্বিগুণ উৎসাহে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

করন্ধম রাজপুরীতে ফিরিয়া গিয়া পুত্রের বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিলেন। অবীক্ষিত বলিলেন, "আমি পরাজয়ের অপমান ভুলতে পারিনি। আমি বিবাহ করব না।"

অবীক্ষিত করন্ধমের একমাত্র পুত্র। করন্ধম বিবাহ না করিলে বংশ লোপ পাইবে, পরকালের পিণ্ডজলের আর কোন আশা নাই। ইহলোকের চিন্তাও রাজাকে আকুল করিল। এত দিনের সুশাসিত রাজ্য, তাহাও পরহস্তগত হইবে। তখন রাজা ও রাণী দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটি অভিসন্ধি স্থির করিলেন।

মহিষী বীরা পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি একটি ব্রতসাধন করব। এ ব্রতের নাম কিমিচ্ছক। এই ব্রতের প্রধান অঙ্গ—ব্রতপালনকালে কেউ কিছু চাইলে তা-ই তাকে দিতে হবে। ধন চাইলে ধন দিতে হবে—তা ত' তোমার পিতার অধীন, আর তোমার উপর যে দান নির্ভর করবে, তা তোমাকে দিতে হবে।"

অবীক্ষিত ভাবিলেন—মাতা তাঁহার ভুজবলের কথাই বলিতেছেন। অবীক্ষিত বলিলেন—"মা, আমার, যা সাধ্য, তা দিয়ে ব্রতপালনে তোমাকে সাহায্য করব—তুমি ব্রত গ্রহণ কর।"

রাণী ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রার্থীদের মুক্তহস্তে দান করিতে লাগিলেন। রাজা একদিন রাণীকে বলিলেন—"আমিও তোমার কাছে প্রার্থী, আমাকে একটি পৌত্র দান কর।" রাণী পুত্রকে বলিলেন—"বৎস, তোমার পিতা যা চাচ্ছেন, তা তোমার শক্তির উপর নির্ভর করছে—তা-ই দাও।" অবীক্ষিত হাসিয়া বলিলেন—"মা, তোমাদের অভিসন্ধি আমি বুঝতে পারিনি। যা-ই হোক, স্বীকার যখন করেছি, তখন আমাকে বিবাহ করতেই হয়—নতুবা পৌত্র তোমরা কি ক'রে পাবে? তবে আমি এক বৎসর সময় চাচ্ছি।"

অবীক্ষিত ভাবিলেন—বিবাহ করিতে হইলে বিশালরাজ-কন্যাকেই বিবাহ করিতে হয়—ঐ রাজকন্যা আমাকে পতিত্বে

বরণ করিয়াছে। কিন্তু একবার যাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছি, তাহার পাণিপ্রার্থনা করি কেমন করিয়া ?”

এদিকে করন্ধম বিশালরাজকে জানাইয়া দিলেন—রাজকুমার বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছে।

বিশালরাজ জানাইলেন—“কন্যা আশ্রমবাসিনী হ'য়ে তপস্যা করছে। এখন কোথায় আছে, জানি না। আগে কাছাকাছি ছিল, সংবাদ পেতাম। আমি খোঁজ ক'রে দেখি, আপনিও খোঁজ করুন।”

ভামিনী করন্ধমের রাজ্যে, এমন কি রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বনেই তপস্যা করিতেছিলেন। অবীক্ষিত একদিন সেই বনে শিকারে গিয়াছিলেন। হঠাৎ শুনিলেন একটি নারীর আর্ত্তনাদ। অবীক্ষিত ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন—একটি দানব একটি নারীকে জোর করিয়া লইয়া যাইতেছে।

অবীক্ষিত দানবকে আক্রমণ করিলেন। দুইজনের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। অবীক্ষিত দানবকে শেষ পর্য্যন্ত হত্যা করিলেন। এইবার অবীক্ষিত রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী বলিল—“আমি করন্ধম রাজার পুত্র অবীক্ষিতের পত্নী,—বিদিশার রাজা বিশালের কন্যা।”

অবীক্ষিত বলিলেন—“কি ক'রে ? রাজপুত্র অবীক্ষিত ত' বিবাহ করেন নি !”

রমণী আদ্যোপান্ত সব কথাই বলিলেন।

অবীক্ষিত আর আত্মগোপন করিলেন না। অবীক্ষিত বলিলেন—“একবার শত্রুজয় ক'রে তোমাকে লাভ করতে পারিনি ব'লে তোমাকে গ্রহণ করতে পারিনি। আজ শত্রুজয় ক'রে তোমাকে লাভ করলাম।”

এই সময়ে ভামিনীর পূর্ব্বজন্মের পিতা তুনয় গন্ধর্ব্ব সেখানে আসিয়া নিজের পরিচয় দিয়া অবীক্ষিতকে বলিলেন—"আমি এই ভামিনীর পূর্ব্বজন্মের পিতা। আমিই তোমার হস্তে এই কন্যা দান করছি। এখন চল আমার পুরীতে, সেখানে উৎসব করতে হবে।"

অবীক্ষিত গন্ধর্ব্বপুরীতে গিয়া ভামিনীর সহিত বৎসরকাল বাস করিলেন। পিতার কাছে সংবাদ পাঠাইলেন বৎসরান্তে গৃহে ফিরিবেন।

এক বৎসরের মধ্যে অবীক্ষিতের একটি পুত্র হইল। অবীক্ষিত সেই পুত্রটিকে মায়ের কোলে অর্পণ করিয়া বলিলেন—"মা, এই নাও তোমার পৌত্র। তোমার কিমিচ্ছক ব্রতের উদ্‌যাপন হোক।"

অবীক্ষিতের এই পুত্রের নাম মরুত্ত। বয়োবৃদ্ধির সহিত তিনিও অসামান্য বীরপুরুষ হইয়া উঠিলেন। মরুত্তের বয়ঃক্রম যখন ষোলো বৎসর, তখন করন্ধম পুত্রকে বলিলেন—"বৎস, বহুকাল রাজ্যপালন করলাম, বৃদ্ধ হয়েছি। এইবার তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর—আমি তপস্যায় অবশিষ্ট জীবন যাপন করতে চাই।"

অবীক্ষিত বলিলেন—"পিতঃ, আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমি রাজ্যভার গ্রহণ করতে পারব না। আমি স্বয়ংবরসভার পরাজয়ের অপমান আজো ভুলতে পারিনি। আমি আত্মরক্ষা করতে পারিনি, রাজ্যরক্ষা করব কেমন ক'রে? তা ছাড়া, আমার মনেও বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছে।"

পুত্রের উত্তরে করন্ধম ব্যথা পাইলেন। কিন্তু তিনি পুত্রের চরিত্র মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতেন। তিনি আর অনুরোধ-উপরোধ করিলেন না। পৌত্র মরুত্তকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি পত্নী বীরার সহিত বনে গেলেন তপস্যার জন্য। করন্ধম কিছুকাল

পরে দেহত্যাগ করিলেন। মহিষী বীরা ভার্গবের আশ্রমে থাকিয়া তপজপ করিতে লাগিলেন।

এই আশ্রমে একদিন সাতটি মুনি-বালককে সর্পে দংশন করিল। মহিষী বীরা ইহাতে ব্যথা পাইয়া একজন তপস্বীকে মরুত্তের কাছে প্রেরণ করিলেন। তাহার মুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"মরুত্ত, শুনেছি তুমি আদর্শ রাজা হয়েছ—প্রজাগণকে অপত্যের মত পালন করছ। কিন্তু তোমার আশ্রমবাসী তপস্বীদের প্রতি দৃষ্টি আছে ব'লে ত' মনে হয় না। এক দিনে সাতটি মুনি-কুমারকে সর্পে দংশন করেছে—এর প্রতিকার তুমি করতে পার না? তুমি তোমার পিতামহের সিংহাসন কলঙ্কিত করলে!"

সংবাদ পাইয়া মরুত্ত তখনই পিতামহীর আশ্রমে ধনুর্ব্বাণ হস্তে উপস্থিত হইলেন। মুনিকুমারদের মৃতদেহ দেখিয়া এবং আশ্রম-বাসীদের বিলাপ শুনিয়া মরুত্তের ক্রোধের সীমা থাকিল না। তখন তিনি ধনুকে সংবর্ত্তক বাণ জুড়িয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"এই শরের অনলে নাগকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক।"

মরুত্তের শরের অনলে যেখানে যত নাগ ছিল, সব পুড়িয়া মরিতে লাগিল। নাগলোকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

মরুত্তের জননী ভামিনী তপস্বিনী অবস্থায় স্বাস্থ্য ও রূপ-যৌবন হারাইলে নাগদের কৃপায় রূপ, যৌবন ও স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়াছিলেন। তখন নাগেরা ভামিনীকে নিবেদন করিয়াছিল—"আমরা যদি কখনও অপরাধ করি, তা হ'লে আপনি আমাদের রাজরোষ হ'তে রক্ষা করবার সাহায্য করবেন, এই প্রতিজ্ঞা করুন।"

ভামিনী বলিয়াছিলেন—"আমি ত' এখন তপস্বিনী, যদি কখনও রাজশক্তি লাভ করি, তা হ'লে অবশ্যই তোমাদের রক্ষা করবার সাহায্য করব।"

এখন নাগেরা সেই কথা স্মরণ করিয়া মরুত্তের জননীর কাছে গিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিল—"আপনার পুত্রের শরানলে সমস্ত নাগলোক ধ্বংস হতে চলেছে। দেবি, আমাদের রক্ষা করুন।"

অবীক্ষিত তখনই ধনুর্ব্বাণ হস্তে ভার্গবের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পুত্রকে অস্ত্রসংহরণ করিতে অনুরোধ করিলেন। মরুত্ত তখন ক্রোধে উন্মত্ত। তিনি বলিলেন—"এরূপ আদেশ করবেন না, পিতঃ! দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন রাজার ধর্ম্ম, তা না করলে আমি নরকগামী হ'ব।"

অবীক্ষিত বার বার মরুত্তকে শান্ত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তিনি বলিলেন—"প্রথমতঃ, পিতার আদেশ; দ্বিতীয়তঃ, তোমার মাতা নাগদের রক্ষা করবার জন্য শপথ করেছেন, তাঁর শপথের মর্য্যাদারক্ষা; তৃতীয়তঃ, নাগকুল শরণার্থী। এই সকল বিবেচনা ক'রে তুমি ক্ষান্ত হও।"

তাহাতেও মরুত্ত অস্ত্রসংহরণ করিলেন না। অবীক্ষিত তখন ক্রোধান্ধ হইয়া কালাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন মরুত্তের অস্ত্রকে প্রতিরোধ করিবার জন্য। পিতা ও পুত্রের মধ্যে সংগ্রামের সূচনা দেখিয়া ভার্গব ও অন্যান্য ঋষি দুইজনের মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। মহিষী বীরা বলিলেন—"আমার কথাতেই মরুত্ত নাগদের দণ্ড বিধান করতে এখানে এসেছে। যদি মুনি-কুমাররা পুনর্জীবিত হয়, তা হ'লে মরুত্ত অস্ত্রসংবরণ করবে।"

নাগেরা পাতাল হইতে সঞ্জীবন ঔষধ আনিয়া মুনিকুমারদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিয়া দিলে সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। অবীক্ষিত জননীর চরণে প্রণাম করিয়া মরুত্তকে আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

মরুত্ত সূর্য্যবংশের একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁহার মত বিরাট যজ্ঞ কোন রাজা করিতে পারেন নাই। প্রজাপালনেও তাঁহার সমকক্ষ কোন রাজা সেকালে ছিলেন না।

মরুত্ত বৃদ্ধ বয়সে বনে তপস্যার জন্য চলিয়া গেলে পুত্র নরিষ্যন্ত রাজা হইলেন। নরিষ্যন্ত দেখিলেন—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ বিরাট যাগযজ্ঞের দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যাগ-যজ্ঞের দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিবার উপায় নাই। ব্রাহ্মণরা অর্থাভাবে নিজেরা যাগযজ্ঞ করিতে পারেন না, রাজার যজ্ঞে তাঁহারা হোতা, উদ্‌গাতা, ঋত্বিক ইত্যাদি হ'ন। তিনি সংকল্প করিলেন—"আমি তাঁদের কারো অর্থাভাব রাখব না। তা হ'লে তাঁরা নিজেরাই যজ্ঞ করতে থাকবেন।"

এই সংকল্প করিয়া নরিষ্যন্ত রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া ব্রাহ্মণদের দান করিয়া বলিলেন—"আপনারা এই অর্থে যজ্ঞ করুন গে।" নরিষ্যন্তের দানের ফলে দেশের সর্ব্বত্রই বড় বড় যজ্ঞ হইতে লাগিল—তাঁহার নিজের যজ্ঞ করিবার আর সঙ্গতি থাকিল না। তিনি এইভাবে কীর্ত্তি রক্ষা করিলেন।

রাজা নরিষ্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে পুত্র দমকে রাজ্যভার দিয়া বনে তপস্যার জন্য গমন করিলেন। মহিষী ইন্দ্রসেনাও তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন।

দম যখন রাজা হইলেন, তখন তাঁহার বয়স অল্প। সেই বয়সেই দম বিচক্ষণ সম্রাটের মত রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

চারুকর্ম্মা রাজার কন্যা সুমনার স্বয়ংবরসভায় দম অন্যান্য রাজপুত্রদের সঙ্গে বিবাহার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারী দমের কণ্ঠেই বরমাল্য অর্পণ করিলেন।

রাজকন্যারা স্বয়ংবরা হইতেন, কিন্তু এই ব্যাপারে বড়ই বিপদ ছিল। কোন রাজকন্যা একজন রাজপুত্রের কণ্ঠে মাল্য দান করিলেন, কন্যার পিতা নির্ব্বাচিত বরের হাত ধরিয়া বিবাহ-মণ্ডপে লইয়া গেলেন, আর অন্যান্য রাজপুত্র বা রাজা বরযাত্রী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—এমন সুসভ্য সুশৃঙ্খল ব্যাপার ক্বচিৎ কখনও ঘটিত।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত বিবাহার্থীরা নিজেদের অপমানিত বোধ করিতেন এবং একযোগে মিলিত হইয়া ভাগ্যবান রাজপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেন। তিনি যুদ্ধ করিয়া যদি সকলকে হারাইয়া দিয়া রাজকন্যাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবেই তিনি রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতেন। স্বয়ংবরসভার আহ্বানকারী রাজা অবশ্য নির্ব্বাচিত রাজপুত্রকে যুদ্ধে সহায়তা করিতেন। স্বয়ংবরসভার চারিদিকে বহু সৈন্যসামন্ত মোতায়েন রাখিয়া তবে বরনির্ব্বাচন করিতে হইত।

দমের কণ্ঠে সুমনা মাল্য দান করিবামাত্র অন্যান্য রাজা ও রাজপুত্র দমকে আক্রমণ করিলেন। ফলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দম একাই রাজন্যদের পরাজিত করিলেন। কেবল বিদর্ভরাজপুত্র বপুষ্মানের সঙ্গে দমকে বহুক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল। শেষ পর্য্যন্ত দম বপুষ্মানের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ী হইলেন। বপুষ্মানকে প্রাণে না মারিয়া দম করুণাবশে ছাড়িয়া দিলেন। দম যেমন বীর ছিলেন, তেমনি দম-গুণেও গুণী ছিলেন। ক্ষমা-গুণের জন্য তাঁহাকে অবশ্য খুবই ভুগিতে হইয়াছিল।

বহু বৎসর পরের কথা। যে বনে নরিষ্যন্ত ও ইন্দ্রসেনা আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলেন, সেই বনে বপুষ্মান একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। গভীর বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পিপাসায়

কাতর হইয়া বপুষ্মান নরিষ্যন্তের আশ্রমেই উপস্থিত হইল। জলপানের পর বপুষ্মান তাপস-তাপসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। নরিষ্যন্ত মৌনব্রত পালন করিতেছিলেন। কাজেই ইন্দ্রসেনা নিজেদের পরিচয় দিলেন।

পরিচয় পাইবামাত্র পাষণ্ড নারকী বপুষ্মান নরিষ্যন্তের জটা ধরিয়া তাঁহাকে তরবারির আঘাতে হত্যা করিয়া বলিল—"দম আমাকে স্বয়ংবরসভায় হারিয়ে সুমনাকে বিবাহ করেছিল—আজ তার প্রতিশোধ হ'ল।"

ইন্দ্রসেনা স্বামীর শোচনীয় পরিণতির কথা দমকে জানাইতে বলিয়া স্বামীর চিতায় অনুমরণে গেলেন। একজন তাপস এই সংবাদ দমকে জানাইলেন। এই সংবাদ শুনিয়া দমের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি শপথ করিলেন—পিতৃহন্তার শোনিতে পিতৃতর্পণ করিবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যসামন্ত লইয়া বিদর্ভ যাত্রা করিলেন।

বপুষ্মান এখন বিদর্ভের রাজা। বপুষ্মান পাষণ্ড ছিল, কিন্তু কাপুরুষ ছিল না। সে দমের সম্মুখীন হইল। দম প্রথমে বপুষ্মানের সেনাপতিগণ, তাহার ভ্রাতা ও সাত পুত্রকে নিহত করিয়া বপুষ্মানকে দুর্ব্বল করিলেন। তারপর তাহাকে আক্রমণ করিলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া দম বপুষ্মানকে রথচ্যুত করিয়া ভূতলশায়ী করিলেন।

বপুষ্মানের বুকে বসিয়া দম তাহার কণ্ঠে খড়্গাঘাত করিলেন এবং অঞ্জলিপুটে তাহার রক্ত গ্রহণ করিয়া পিতৃতর্পণ করিলেন। আকাশের দিকে চোখ খুলিয়া তিনি বলিলেন—"হে পিতঃ, তোমার আত্মা আজ তৃপ্ত হউক।"

[মার্কণ্ডেয়পুরাণ

পৌরাণিক সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই, দুইজন মহীয়সী নারী অতুল বৈভবের মধ্যে জীবনযাপন করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। একজন ঋতধ্বজ রাজার মহিষী মদালসা, তাঁহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একজন মালবরাজ শিখিধ্বজের মহিষী চূড়ালা। গৃহসংসারের সহস্র প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও অবিচলিতভাবে আধ্যাত্মিক সাধনা যে কত বড় তপস্যা, তাহা মদালসার মত চূড়ালাও দেখাইয়াছেন।

চূড়ালা তপস্বিনী হইলেও রাজমহিষীর নিত্য কর্ম্মসাধনে তাঁহার বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। স্বামীর সহিত সর্ব্ববিষয়ে সহ-যোগিতাতেও তাঁহার কোন ভুলভ্রান্তি হইত না। চূড়ালার সাধনা ছিল নিভৃতে—এই সাধনার সন্ধান তাঁহার স্বামীও রাখিতেন না। চূড়ালা যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহার অঙ্গের

দিব্যজ্যোতিতে তাহা প্রতিফলিত হইত। অঙ্গের অসামান্য জ্যোতি কোথা হইতে আসিল, শিখিধ্বজ তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ভাবিতেন—বুঝি রাজভোগেই ঐ কান্তি তাঁহার অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়াছে।

চূড়ালা অবশ্য রাজভোগ্য উপকরণ কিছুই বর্জ্জন করেন নাই—অনাসক্তভাবে তিনি ভোগ করিতেন। তাঁহার কাছে স্বর্ণপাত্রে ও মাটির পাত্রে কোন প্রভেদ ছিল না। রাজর্ষি জনক যেভাবে রাজৈশ্বর্য্যের মধ্যেই সাধনা করিয়াছিলেন, চূড়ালাও সেইভাবেই যোগ, ধ্যান, তপ-জপ ইত্যাদির অনুষ্ঠানে সাধনা করিতেন।

পরম সাধিকা মীরাবাঈ চরম প্রেমভক্তি লাভ করিলে ভোগাসক্ত স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিতে পারেন নাই। কিন্তু চূড়ালা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও তাহা পারিয়াছিলেন। অরুন্ধতী, অনসূয়া, লোপামুদ্রা ইত্যাদি ঋষিপত্নীর জীবনে এইরূপ সমস্যাই ঘটে নাই।

চূড়ালার সহিত ধর্ম্মপথে শিখিধ্বজের কোন যোগ ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয়, তবু কেবল চূড়ালার সংসর্গেই শিখিধ্বজের মনে ক্রমে বৈরাগ্যের উদয় হইল। মনে বৈরাগ্যের উদয় হইবামাত্র শিখিধ্বজ রাজসংসার ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

চূড়ালা দেখিলেন—বিনা সাধনায় সহসা যে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তাহা স্থায়ী হইবে না। অথচ রাজার মনে পরম ধনের জন্য যে পিপাসা জন্মিয়াছে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়।

চূড়ালা রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন, রাজা তীর্থপরিক্রমায় যাত্রা করিয়াছেন। যতদিন না ফিরেন, ততদিন তিনিই রাজ্যপালন করিবেন। চূড়ালা সারাদিন নিয়মমত ধর্ম্মানুসারে রাজকার্য্য

করিতেন। রাত্রিকালে পুরুষবেশে রাজার আশ্রমে গিয়া রাজাকে জ্ঞান ও উপদেশ দিতেন। পুরুষবেশী চূড়ালাই রাজার গুরু হইলেন। ক্রমে রাজা সংসারের অসারতা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে লাগিলেন। চূড়ালা গুরুরূপে রাজাকে রাজসংসারে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন, কিন্তু রাজা আর ফিরিতে চাহিলেন না।

চূড়ালা এইবার রাজাকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ক্রমে রাজার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিল। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া রাজা বুঝিতে পারিলেন—রাজধর্ম্মপালন ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী নয়, ব্রহ্মজ্ঞানীর পক্ষে সংসারে আর সন্ন্যাসে কোন প্রভেদ নাই, বনে ও ভবনে কোন পার্থক্য নাই, সোনা ও শিলাখণ্ডে কোন তফাৎ নাই।

তখন চূড়ালা আত্মপ্রকাশ করিয়া রাজাকে আবার রাজসংসারে ফিরাইয়া আনিলেন। শিখিধ্বজও রাজর্ষি জনকের মত রাজধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন।

[যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও বিষ্ণুপুরাণ]

চন্দ্রবংশে সহস্রানীক নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি সন্তানবৎ প্রজাপালন করিতেন, দীনদুঃখীদের অকাতরে দান করিতেন, অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি বলিতেন —"আমি পুণ্য-অর্জনের জন্য এ সব কার্য্য করি না। ইহাতে আমার স্বর্গলাভ হইবে, তাহাও আমি মনে করি না। এ সব আমার রাজধর্ম্মের অন্তর্গত,—আমার কর্ত্তব্য।"

সহস্রানীকের পিতা শতানীক বহু রাজ্য জয় করেন। তাঁহার ধনভাণ্ডার ছিল পূর্ণ। তিনি ব্রাহ্মণদের মুক্তহস্তে দান করিতেন, তাহাতে দেশে যাগ-যজ্ঞের ঘটা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। নিজেও তিনি বড় বড় যাগ-যজ্ঞ করিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। সহস্রানীক কিন্তু যাগ-যজ্ঞে অর্থব্যয় করিতেন না এবং ব্রাহ্মণদের কোন দান-দক্ষিণা দিতেন না। অর্থাভাবে ব্রাহ্মণরাও আর যাগ-যজ্ঞ করিতে পারিতেন না।

তাঁহাদের অনেকে রাজার কাছে আসিয়া বলিলেন—"মহারাজ, আপনার পিতা যেমন নানাভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তেমনি দু'হাতে আমাদের দান করতেন। আমাদের তাতে যাগ-যজ্ঞ চলত, অন্নেরও অভাব হ'ত না আমাদের ঘরে। আমাদের অন্য বৃত্তিতে অর্থ উপার্জ্জন করতে হ'ত না। বিনা শ্রমেই আমাদেব সংসার বেশ চ'লে যেত। আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে পারতাম। আর আপনি একেবারে দান বন্ধ ক'রে দিলেন। আপনার রাজত্বে আমাদের দুর্দ্দশার অবধি নেই। অন্ন-বস্ত্রের জন্য আমাদের নানা বৃত্তি আশ্রয় করতে হচ্ছে। বড়ই পরিতাপের বিষয়।"

মহারাজ বলিলেন—"এ সব ত' আমি জানি। আপনারা বেশ সুখেই ছিলেন এবং আমার পিতার আত্মার সদ্‌গতি কামনাও করতেন, তিনিও অনেক পুণ্য অর্জ্জন ক'রে গেছেন। আমি জানতে চাই,—আমার পিতার কিরূপ সদ্‌গতি হয়েছে। তিনি এখন কোন্ লোকে কি ভাবে আছেন, সেই কথাটা যদি আপনারা আমাকে জেনে দেন, তা হ'লে আবার পিতার মত দানধ্যান সুরু করব।"

ব্রাহ্মণগণ এই সংবাদ জানিবার জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে শেষে ভার্গব ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ ভার্গব ঋষিকে বলিলেন—"মহর্ষি, আমাদের এক প্রার্থনা আছে—আপনি যদি দয়া ক'রে জেনে দেন, মহারাজ শতানীক এখন কোন্ স্বর্গে কিভাবে আছেন, তা' হ'লে তাঁর পুত্র আমাদের ধন দান করবেন। যতদিন তা' না জানতে পারবেন, ততদিন তিনি আমাদের কিছুই দেবেন না।"

ভার্গব ব্রাহ্মণদের প্রার্থনায় বিগলিত হ'য়ে সূক্ষ্ম শরীরে

স্বর্গে গেলেন। সেখানে গিয়া দেবদূতদের মুখে শুনিলেন—"শতানীক নামে এক রাজা স্বর্গে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুণ্যের সঞ্চয় বেশী ছিল না ব'লে অল্পদিন পরেই পুণ্যক্ষয়হেতু নরকে গিয়েছেন।"

ভার্গব নরকেই শতানীকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ভার্গব শতানীককে বলিলেন—"এ কি মহারাজ! আপনি অজস্র দানের পুণ্য অর্জ্জন ক'রে শেষে নরকে এলেন কেন? আমি আপনার পুত্রের কাছ হ'তেই আপনার গতির কথা জানতে এসেছি।"

শতানীক বলিলেন—"মহর্ষি, আমার পরম ভাগ্য যে, আপনি আমার অবস্থা স্বচক্ষে দেখতে এসেছেন। আমার দানে কিছুমাত্র পুণ্য হয়নি; কারণ, যে ধন আমি দান করেছি, সে ধন হয় পররাজ্যলুণ্ঠনের ধন, নয় ত প্রজাশোষণের ধন। ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য সে ধন দান করায় আমার পাপই হয়েছে, আর ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মকর্ম্মও নষ্ট হয়েছে। সেই পাপে আমার নরকবাস। যৎসামান্য পুণ্য অন্য ভাবে অর্জ্জন করেছিলাম ব'লে কিছুকাল স্বর্গবাস হয়েছে। কোন্‌টা পুণ্য, কোন্‌টা পাপ, আমরা জীবদ্দশায় বুঝতে পারি না। পরলোকে এসে বুঝতে পারা যায় কোন্‌টা আসল পুণ্য, কোন্‌টা পাপ। বড় সূক্ষ্ম হিসাব এখানে।"

ভার্গব—এখন উপায় কি, মহারাজ?

রাজা—এখন উপায় পুত্র সহস্রানীক যদি আমার ধনভাণ্ডার হ'তে আর ব্রাহ্মণদের দান না করে, তাহ'লে পাপবৃদ্ধি হবে না।

ভার্গব—আপনার পুত্র নিজের বুদ্ধিতেই সে দান বন্ধ ক'রে

দিয়েছেন। তাতে আপনার নরকভোগ বাড়বে না, কিন্তু নরক হ'তে সত্বর অব্যাহতি পাওয়ার উপায় কি?

রাজা—উপায় আছে। পুত্র যদি সম্পূর্ণ সদুপায়ে শ্রমার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণদের দান করে, তা হ'লে আমার স্বর্গলাভ হ'তে পারে।"

রাজা সহস্রানীকের রাজসভায় আসিয়া ভার্গব সব কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজা শুনিয়া উত্তর দিলেন—"মহর্ষি, আমি এইরূপই অনুমান করেছিলাম; এখন আপনার কৃপায় পিতার উদ্ধারের পথের সন্ধান পেলাম।"

মহারাজ সহস্রানীক তাঁহার মন্ত্রী ও অমাত্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখুন, আমি এক বছরের জন্য তীর্থভ্রমণে যাব, কোন পাথেয় নেব না, সাথী কাউকে নেব না। একা পায়ে হেঁটেই যাব। আমার শিশুপুত্র উদয়নকে সিংহাসনে বসিয়ে আপনারা রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করুন, আমার সদনুষ্ঠান সব বজায় রাখবেন। প্রজার নিকট হ'তে একটি কড়িও বেশী কর নেবেন না, রাজপুরীতে কোন বিলাসিতা থাকবে না, উৎসবাদি হবে না।"

মন্ত্রী ও অমাত্যগণ অবাক হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইতে লাগিল।

মহারাজ বলিলেন—"অবাক হবেন না, পিতার সদ্‌গতির জন্য আমাকে রাজ্য ত্যাগ ক'রে তীর্থপরিক্রমায় যেতে হচ্ছে।"

এই বলিয়া মহারাজ রাজধানী ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি বহু দূরদেশে গিয়া পড়িলেন। সেখানে দেখিলেন, একটি নগরের বাহিরে একটা বৃহৎ দীঘি কাটানো

হইতেছে। হাজার হাজার শ্রমিক মাটি কাটিতেছে। মহারাজ নিজে শ্রমিকদের দলে ভিড়িয়া পড়িলেন। শ্রমিকদের কুটীরেই তিনি থাকিতেন এবং দুইবেলা ছাতু খাইতেন। দিনের পর দিন তিনি শ্রমিকের কাজ করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রমিকের কাজে তিনি এতই দক্ষতা দেখাইলেন যে, তাঁহার পারিশ্রমিক বাড়িয়া গেল—তিনি শ্রমিকদের সর্দ্দার হইয়া উঠিলেন।

এইভাবে এক বৎসর শ্রমিকের কাজ করিয়া তিনি যাহা সঞ্চয় করিলেন, তাহা লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজপুরীর কেহ প্রথমে চিনিতেই পারে নাই। রুক্ষ কেশ, জীর্ণ বেশ, মুখভরা দাড়ি, গায়ের রঙ তামাটে হইয়া গিয়াছে, হাতে পায়ে শিরা বাহির হইয়াছে—চেনা খুবই শক্ত।

সহস্রানীক ব্রাহ্মণদের ডাকিয়া তাঁহার সঞ্চিত অর্থ তাঁহাদিগকে দান করিয়া বলিলেন—"আমার এই দানের পরিমাণ সামান্য, এর পর আমি আপনাদের কথা ভাবব। আপনারা এই অর্থে ধর্ম্মকর্ম্ম ক'রে আমার পিতার সদ্‌গতি কামনা করুন।"

ব্রাহ্মণেরা দানের পরিমাণ দেখিয়া হাসিলেন কিন্তু রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মুখে তাঁহার জয়গান করিতে করিতে আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা ভাবিলেন—"যা হোক, রাজার বদ্ধমুষ্টি ত' খুলল! এখন রাজা আস্তে আস্তে মুক্তহস্ত হবেন।"

সহস্রানীক রাজভাণ্ডার শূন্য করিয়া দীনদুঃখীদের দান করিলেন। পিতার আমলের একটি টাকাও ভাণ্ডারে অবশিষ্ট থাকিল না।

তারপর মন্ত্রীদের বলিলেন—"আপনারা নতুন ক'রে ধনভাণ্ডার গ'ড়ে তুলুন, একটি কড়িও যেন অন্যায়পথে তাতে প্রবেশ

না করে। আপনারা যেমন বেতন পান, আমারও তেমনি একটা বেতন ঠিক ক'রে দিন—আমার জন্য বা আমার পরিজনদের জন্য তার বেশী একটি কড়িও ব্যয়িত হবে না। তা হ'লেই রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব হবে না। উদ্বৃত্ত অর্থ সদনুষ্ঠানে ব্যয় করা হবে।"

এইভাবে ছয়মাস অতীত হইলে ঋষি ভার্গব আবার নরকে গেলেন। নরকে গিয়া শুনিলেন, রাজা শতানীক স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। এ সংবাদ তিনি সহস্রানীককে জানাইয়া নিজের তপোবনে চলিয়া গেলেন।

[শিবপুরাণ]

বিদ্যাধররাজ জীমূতকেতু বৃদ্ধ বয়সে যুবরাজ জীমূতবাহনের হস্তে রাজ্যভার দিয়া মলয়পর্ব্বতে আশ্রমবাস করিতে চলিয়া গেলেন। সঙ্গে গেলেন তাঁহার মহিষী। জীমূতবাহনের রাজ্যসুখ ভাল লাগিল না, মন্ত্রীদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া আশ্রমে আসিয়া তিনি বলিলেন—"বাবা, আপনাদের ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না, আমার রাজ্যে কাজ নেই। আমি আপনাদের চরণসেবা করতে চাই। কত দিনই বা আপনারা বাঁচবেন! যত দিন বাঁচবেন, তত দিন আমাকে শ্রীচরণ-ছাড়া করবেন না।"

জীমূতকেতু অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু জীমূতবাহন কিছুতেই গৃহে ফিরিতে রাজী হইলেন না।

একদিন পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে করিতে হাড়ের পাহাড় দেখিয়া তিনি এক সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওখানে অত হাড় কেন?"

সঙ্গী বলিলেন—"কুমার, গরুড় নাগরাজ্যে বড় উপদ্রব করত। প্রত্যহ বহু নাগের ধ্বংস সাধন করত। নাগরাজ গরুড়কে

বললেন—প্রভু, একটি নাগ হ'লেই আপনার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। মিছে কেন প্রত্যহ এতগুলি নাগের ধ্বংস সাধন করেন? আমি প্রত্যহ এক একটি নাগ আপনার আহারের জন্য পাঠিয়ে দেব। গরুড় তাতেই রাজী হয়েছেন। বহুদিন হ'তে সাপের হাড় জমে জমে ঐ পাহাড় হয়েছে।"

জীমূতবাহন এই কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন—"এই হত্যাকাণ্ড নিবারণ করা যায় না? কখন গরুড় আসেন?"

সঙ্গী বলিলেন—"প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।"

পরদিন সূর্য্যোদয়ের আগেই জীমূতবাহন ঐ পাহাড়ে আসিয়া দেখেন,—শঙ্খচূড় নামক নাগের মাতা শঙ্খচূড়কে বুকে ধরিয়া কাঁদিতেছে। আজ শঙ্খচূড়ের পালা। যুবরাজ সব কথা শুনিয়া বলিলেন—"মা, তুমি কেঁদ না। তুমি বাড়ী যাও, তোমার ছেলের বদলে গরুড়ের মুখে আমিই প্রাণ দেব।"

শঙ্খচূড় তাহাতে রাজী হইল না। সে বলিল—"সে কি? কেন সামান্য একটা নাগের জন্য প্রাণ দিতে যাবেন? আমি স্বচ্ছন্দে মরতে পারব—দয়া ক'রে আমার মাকে দেখবেন।"

জীমূতবাহন কত বুঝাইলেন। শঙ্খচূড় রাজী হইল না। গরুড়ের আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী, তখন শঙ্খচূড় শিবমন্দিরে শেষ প্রণাম করিতে গেল। এই অবসরে জীমূতবাহন পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া শুইয়া পড়িলেন। গরুড় নিকটেই ছিলেন—তাঁহার খাদ্য মনে করিয়া গরুড় নামিয়া আসিলেন। গরুড় ভোজন আরম্ভ করিলেন—কিন্তু রক্তমাংসের স্বাদ নূতনতর মনে হওয়ায় ঠোঁট তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে তুমি? তুমি তো নাগ নও।"

এমন সময় শঙ্খচূড় ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—"থামুন, পক্ষিরাজ, আমি আপনার খাদ্য। আপনি ভুল ক'রে কাকে খাচ্ছেন?"

গরুড় আহারে নিবৃত্ত হইয়া বলিলেন—"আপনি কোন্ মহাপুরুষ? আপনি কেন এমন ক'রে প্রাণ দিচ্ছেন?"

জীমূতবাহন কহিলেন—"আমি বিদ্যাধর-রাজকুমার জীমূত-বাহন।"

গরুড় বলিলেন—"সর্ব্বনাশ! আমি করেছি কি? আমি আপনার ন্যায় মহাপুরুষের প্রাণ বধ করতে উদ্যত হয়েছি! আমার কি প্রায়শ্চিত্ত হবে?"

জীমূতবাহনের দেহ হইতে দরদর করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। গরুড় স্বর্গে গিয়া অমৃত আনিয়া জীমূতবাহনকে বাঁচাইলেন।

গরুড় কহিলেন—"কুমার, আপনি বর প্রার্থনা করুন।"

জীমূতবাহন বলিলেন—"পক্ষিরাজ, যদি বর দিতে চান, তবে আজ হ'তে আপনি জীবহিংসা ত্যাগ করুন। আপনি যে খাদ্য চান, আমি প্রত্যহ আপনাকে সেই খাদ্য যোগাব। আমার প্রকাণ্ড রাজ্য—আপনি যা খেতে চান, তা-ই পাবেন। আর জীবহিংসা করবেন না।"

গরুড় সেইদিন হইতে জীবহিংসা পরিত্যাগ করিলেন।

(এই কাহিনীটি 'কথাসরিৎসাগর' ও 'বৃহৎ কথামঞ্জরী'তে আছে। ইহাকে পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াই ধরা হইল।)

সমাপ্ত